JULY, 1948
(ASHAR, 1355)

Asutosh College Patrika

Professor-in-Charge
KATYAYANIDAS BHATTACHARYA, M.A.

Vol. XXIII No. 1.

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৫৫

: সম্পাদক সঙ্ঘ :

নীলিমা বসু

বীথি সেন

সুনীল দাশগুপ্ত, প্রতুল বর্ধনরায়, পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী

প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

: সঙ্ঘ প্রধান :

তেজেন গুহ রায়

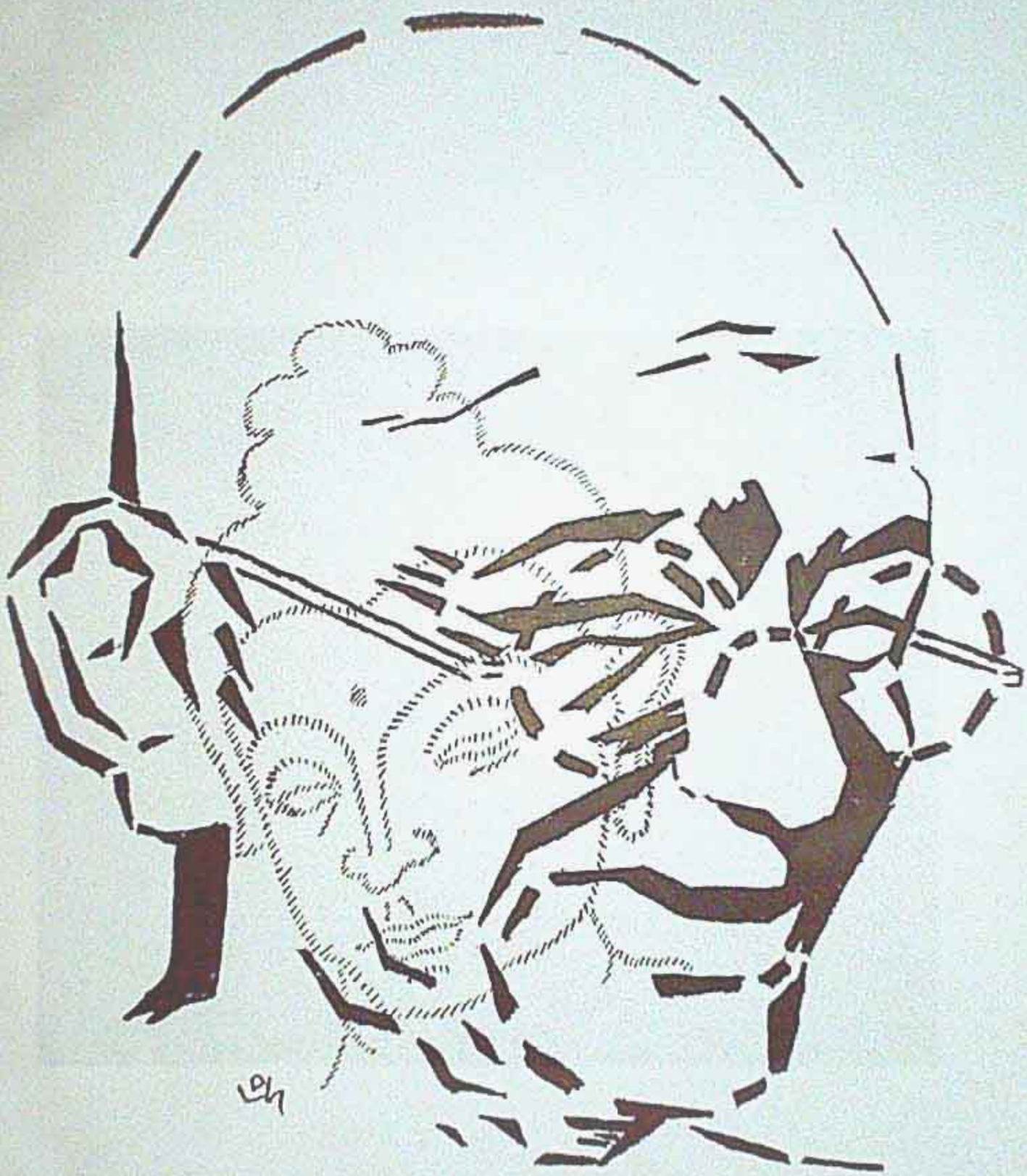

"সম্ভবামি যুগে যুগে"

[শিল্পী—প্রণব ব্রত দত্ত, তৃতীয় বর্ষ— বাণিজ্য]

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড } আষাঢ়, ১৩৫৫ { প্রথম সংখ্যা

মহাত্মার ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

যা ধারণ করা যায়, যে-নীতি বা যে আদর্শ অবলম্বন করে' মানুষ কাজ করে, শাস্ত্র বলে, তা-ই ধর্ম।

যা ধারণ করে আছি, তার স্বরূপ কী, তা আমিই জানি, আর জানেন আমার অন্তর্যামী। তুমি জানো, কী ধারণ করে' তুমি অতিবাহন করো জীবনের পথ—কী অবলম্বন করে অনুভব করো কর্মের প্রেরণা।

যা ধারণ করে আছি, তা যখন আমাকে মঙ্গলের অভিসারে আকর্ষণ করে, তখন নিশ্চয়ই বুঝি, শয়নে স্বপনে তা আমাকে ধারণ করেই থাকতে হবে—সংসারের কোন বাধা, কোন বিপত্তি, অর্থহীন কোনো তর্কের উদ্বেগ—আমাকে বিশ্বাসের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আমি ধীর থাকবো, স্থির থাকবো, থাকবো স্থিতধী।

কিন্তু ব্যক্তিগত মঙ্গলই কি মঙ্গল নামের উপযুক্ত? যা আমার আদর্শ, যা আমার ধর্ম, তা যদি আমার দলের বা আমার দেশের মঙ্গলেই থাকে নিযুক্ত, যদি আমার মঙ্গল অভিলাষ করে তোমার অমঙ্গল, তবে তা' কি মঙ্গল নামের উপযুক্ত হবে?

ধর্ম ব্যক্তি-মঙ্গলের শুধু নয়, বিশ্বমঙ্গলেরও আবাহক। এটা যদি না হয়, তবে তা ধর্ম নয়; যা ধারণ করে আছি, তা সব সময়ে হয়তো শুভ নয়; যা শুভ নয়, তা অধর্ম। যা শুভ, যা ধ্রুব—যা প্রত্যক্ষভাবে না হ'ক, অন্তত পরোক্ষভাবে তোমার এবং আমারও কল্যাণকর, ধর্ম তা-ই।

শুভ-কে অন্তরে ধারণ করে' শুভানুসারী কর্মে যখন আত্মনিয়োগ করি, ধর্মের মর্মকথা তখন বোঝা সহজ হয়। ধর্মের মর্মকথা যার পক্ষে দুর্বোধ্য, মহাত্মার বাণী কিংবা মহাত্মাদের জীবন তার কাছে অর্থহীন।

ভারতের মহাত্মাকে বুঝতে হলে—ধর্ম জানা চাই, চরিত্রে প্রতিভাত করা চাই—কর্মে রূপান্তরিত করা চাই। গৃহগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত সকল কর্মের মধ্যেই যদি ধর্মের মহান আদর্শ সঞ্চারিত করতে পারি, তবেই মহাত্মাকে বোঝা সম্ভব, মহাত্মার জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ-কে জানা সম্ভব।

ধর্মের মর্মকথা আমাদের আজ জানতেই হবে। অর্থহীন তর্ক করো না। বাহাদুরী করে তর্কবাগীশ

506

কিছু বলতে চাই

আমাদের এই পত্রিকা গত আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হবার জন্য পা বাড়িয়েছিল; কিন্তু সে আসতে আসতে আপনাদের কাছে এই মাসে এসে হাজির হোল—তাই পত্রিকায় প্রকাশিত ছাত্র ও ছাত্রী-বন্ধুদের লেখায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের স্থানে প্রথম ও তৃতীয় বর্ষ ছাপা হয়েছে।

পত্রিকাকে যথাসাধ্য সুন্দর, রমণীয় ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্প, বিশেষ করে কবিতার লেখক ও লেখিকা আজ কাল এত বেশী হয়ে গেছে যে আমার মতে একটা আইন করে গল্প ও কবিতা লেখা কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

সবার শেষে বিদায়ী অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষদ্বয়, অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বৃন্দের জন্য রেখে গেলাম আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সম্পাদক ও সম্পাদিকাদের জানাচ্ছি আমার অভিনন্দন। আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই আমার সমস্ত ছাত্র ও ছাত্রী বন্ধুদের।

তেজেন গুহ রায়
প্রধান সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY ESTD. 1916

এই সংখ্যায় আছে

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	মহাত্মার ধর্ম —অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	১
২।	বাস্তব ও তুমি —উপেন্দ্রনাথ সমাজদার	৭
৩।	নতুন প্রাণী —বীথি সেন	৮
৪।	লেবোরেটরী —নীলিমা গঙ্গোপাধ্যায়	৯
৫।	দুফোটা চোখের জল —নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী	১৩
৬।	বর্তমান বাঙলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ —পি. কে. ভট্টাচার্য	১৪
৭।	সৈনিক —কেশব চৌধুরী	১৬
৮।	বং সাইড —দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ	১৯
৯।	প্রচণ্ড শীতের এক রাতে —পূর্ণেন্দু মল্লিক	১৭
১০।	ছাত্র সমাজে খেলাধূলার গতি —উমাদাস মৈত্র	১৯
১১।	অপরাধী বৈজ্ঞানিক —হরিপদ দাস	২০
১২।	অনাদৃতা —শৈলেন দাস	২২
১৩।	স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ —নকুলেশ্বর রাহা রায়	২৩
১৪।	ঐ সুদূরের গাঁয় —ধীরেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার	২৫
১৫।	বিশ্বকবির শেষ বাণী —কালীসাধন মুখোপাধ্যায়	২৬
১৬।	এক রাত্রি —বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম-এ	
১৭।	ভাঁটা —সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮।	ভাববাদের তাৎপর্য্য ও প্রকারভেদ —অধ্যাপক শ্রীকাত্যায়নী দাস ভট্টাচার্য্য	৩৫
১৯।	চিরন্তনী —সরোজরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৩৯
২০।	দেশীয় ভাষায় টেলিগ্রাম —অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য	৪৪
২১।	পাঁচমিশালি —তেজেন গুহ রায়	৪৬
২২।	গরলামৃতম —তাপস হালদার	৪৯
২৩।	ব্যবধান —ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী	৫০
২৪।	আমরা যারা চলে যাচ্ছি	৫১
২৫।	বাঙলা সাহিত্য সমিতি	৫২
২৬।	আমাদের ছাত্রাবাস	৫২, ৫৩
২৭।	সম্পাদকীয়	৫৪
১।	গঁগা কী রবানী —রাধাকৃষ্ণ রায়	৫৬
1.	Economic India—Present and Future —Gour Mohan Sen	1
2.	Is This Humanity ? —Sobhanlal Mookherjea	4
3.	Aviation in India —Subrata Mukhopadyay	5
4.	Ice-Skating at Simla —Mira Arora	8
5.	Our Neglected Resources —Dipankar Bhattacharya	9
6	The Darkest Evening —Nirmalendu Dutta Roy	12
7.	Book Review —K. B.	14
8.	OUR UNION (Morning, Day and Commerce)	14, 15
9.	Annual Social Gathering (Day)	16
10.	College Athletics (Day)	16

ASUTOSH COLLEGE
ESTB. 1916
LIBRARY

অধার্মিক সাজতে হয় সাজো, কিন্তু গোপনে ধর্মকে প্রতিভাত করো চরিত্রে, ব্যক্তি-জীবনকে উজ্জ্বল করো সৎ ও শিবের জ্যোতিমহিমায়; পারো তো রাজনৈতিক কলুষপংকিল মানসক্ষেত্রেও ধর্মের শুদ্ধতা সঞ্চারে করো সাধনা। পরাধীন ও স্বাধীন যুগের সন্ধিক্ষণে রাজনীতি যখন লক্ষবিধ অর্থনীতির পাপ-প্রতারণায় আচ্ছন্ন, ব্যক্তি-জীবনের সৎ সাধনায় যদি সেই অমাচ্ছন্ন রাজনীতির মধ্যে ধর্মের জ্যোতি প্রবেশ করাতে পারো, একটা কাজের মতো কাজ করা হবে, রাহুগ্রস্ত পৃথিবী তখন সূর্যোপাসক হবে অচিরাৎ।

মহাত্মা জীবন দিয়ে এই বাণীই কি প্রচার করে যান নি? তরুণ-জীবনে আমরা কি তাঁর বাণী গ্রহণে প্রস্তুত আছি?

আমার ধারণায়, তরুণ জীবনে ধর্মের যথার্থ মর্ম-উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করার অর্থ, একটা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার-ই সমাধান করা। এই আমার স্থির বিশ্বাস, রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামে সেই তরুণ-ই উপযুক্ত সৈনিক হতে পারে, যে ধর্মের প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করে' ব্যক্তিগত জীবনকে নিঃস্বার্থ ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে। অনেকে বলে বটে, যে, রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নেই রাজনীতির ভেতর ধর্ম এলে, তা' হয় ভুয়ো হয়ে যাবে, না-হয় ধর্মের দোহাই দিয়ে সেই রাজনীতি বঞ্চনানীতিকে গোপনে অনুসরণ করবে। কথাটা একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিই নে। আমি দেখেছি, ধর্মের কথা আউড়ে,—পুস্তকে, পত্রে-পত্রিকায় এবং লক্ষ বক্তৃতায় ধর্মের বাণী উদ্ধৃত করে', অনেক শোষক-তন্ত্রী রাজনৈতিক—নিরীহ অজ্ঞ-জাতিকে ঠকাবার বেশ চূড়ান্ত সুযোগ নিয়েছে। সমাজের মধ্যেও দেখা যায়, সাধারণের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি থাকার জন্যে, একদিকে যেমন ধূর্ত পুরোহিতবৃন্দের মন্ত্র-ব্যবসাটা বেশ সহজে চলে, অপরদিকে ধর্মের আচার বিচার, জাত-বিজাত বিচার ও মনুসংহিতার লক্ষমুড়ী আইন-অনুশীলন-স্পৃহা প্রভৃতি থাকার দরুণ সময়ে সময়ে মানুষে মানুষে বেশ বিবাদ-বিসংবাদও বেঁধে যায়। দেশের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারিটা তো দৈনন্দিন ব্যাপার। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যটা তো ধর্মের বিবাদ বিসংবাদের ভিত্তির উপরেই স্থাপিত; ধর্ম-সম্পর্কিত যে প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে তো জেনেছি, ধর্মের লড়াই নিয়ে সেকালের মানুষের চিত্তের কত লজ্জাকর অধঃপতনই না হয়েছিল!

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ধর্মের মধ্যে অবশ্য উদারভাব এসে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু এই সময়ে পাদরীগণের গোপন ধর্মপ্রচারের স্রোতমুখে বাধা প্রদানের জন্যে হিন্দুধর্ম রামমোহনের হৃদয়লোকে নবরূপে প্রতিভাত হয়ে যে-তত্ত্ব প্রচার করলো, তা' একান্তভাবে সত্য হলেও, তর্ক ও অশান্তি কিছু কমায় নি। সাকার এবং নিরাকারতত্ত্ব নিয়ে দার্শনিক তর্কসমর একদা এমনি ভীষণ হয়ে উঠেছিল, যা' সামান্যতম মতমালিন্য থেকে মনোমালিন্যের পর্যায়েই উন্নীত হয়েছিল। এই তো গেল হিন্দু এবং তার পালিত-পুত্র ব্রাহ্মধর্মের কথা। কিন্তু ভারতবর্ষের আর একটি বড় ধর্ম রয়েছে যেটিকে বাদ দেওয়া কিছুতে চলে না। সেটি ইস্‌লাম ধর্ম। সমস্ত ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামকৃষ্ণ-সাধনায় তা প্রমাণিত এবং বিবেকানন্দ-প্রতিভায় প্রচারিত হয়ে গেলেও,—সাকার ও নিরাকার তত্ত্বের বাদ-বিসংবাদ দেশ থেকে গেল না। হিন্দু-দর্শনে এই তত্ত্বের প্রতি যথার্থ আস্থা ও বিশ্বাস দেখতে পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু বাস্তব-ব্যাপারে হিন্দু সাকার-সাধক; কিন্তু মুসলমান-দর্শনে সাকারের একেবারে স্থান নেই। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-বিদ্বেষ দেখা যায়, তার মূল কারণ রাজনীতিই বটে; কিন্তু ধর্মের তত্ত্ববিচারটাও হিন্দু-মুসলীম ভেদ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করেছে কিনা ভাবার বিষয়। কে না জানে, নিরাকারবাদী মুসলমান হিন্দুকে বলে—পৌত্তলিক; কিন্তু ভুলেও কি বুঝতে চায়—হিন্দু সত্যসত্যই পৌত্তলিক নয়? চিত্তকে ধীর স্থির রাখবার জন্যে, একনিষ্ঠ করবার জন্যে, একটা প্রতীক সে সংগ্রহ করেছে মাত্র - কিন্তু আসলে সে অতীন্দ্রিয়কেই পূজা করে;—হিন্দু সাধক রামকৃষ্ণ

কালীমূর্তিতে শুধু কালীকেই দেখেন নি, কালীমূর্তিতে চিত্ত ধ্যাননিবিষ্ট করে' তিনি ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে—আকাশে, বাতাসে, ইন্দ্রিয়ে, অতীন্দ্রিয়ে, দৃশ্যে, অদৃশ্যে—বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশ্বাতীতে—সর্বত্র তিনি এক মহাসত্তাকে নিরীক্ষণ করেছিলেন,—"all kinds of fruit ripen upon its boughs at the same time; side by side are found all kinds of gods—from the most savage to the highest,—to the formless God, the Unnamable, the Boundless one....Always the same tree."—এই তত্ত্বটা না বোঝার দরুণ মুসলমান হিন্দুধর্মকে মনে করে পৌত্তলিক-ধর্ম; আবার বিদ্বেষী হিন্দুও মুসলমানকে ধর্মহীন মনে করে, বলে তাদের ধর্ম ম্লেচ্ছ-ধর্ম। নিজের আচার-বিচারের সঙ্গে মুসলমানের আচার-বিচারের বিশেষ কোন মিল দেখতে পায় না বলে' সাধারণ হিন্দু মনে করে—মুসলমানদের ধর্ম বুঝি অসার; তার মধ্যে ভাববার, কি বোঝবার কিছু নেই। আসল কথা ইসলাম দর্শনেও পবিত্রতা ও প্রেমের যথেষ্ট স্থান আছে—এবং কোরাণে সবার ওপরে এমন একটি হৃদয়বৃত্তির বিশ্লেষণ ও আলোচনা আছে—যা পৃথিবীর সকল মানুষেরই অনুকরণীয়—সেটি হচ্ছে—বৈরাগ্যময় শৌর্যবৃত্তি। হজরত মোহাম্মদ থেকে আরম্ভ করে যে চারিজন খলিফাকে ইসলাম ধর্মের জয়-ধ্বজা বীর বিক্রমে আকাশপথে উড়াতে দেখেছি—তাঁরা শুধু ধর্মবীর নন, তাঁরা কর্মবীর, রাষ্ট্রনিয়ন্তা। রাষ্ট্র-পরিচালনায় ধর্ম কতদূর সাহায্য করে—তাদের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করে সম্যক্ জানা যায়। অন্তরে সম্পূর্ণভাবে বৈরাগী, স্বার্থহীন ও নিষ্কলুষ থেকে রাষ্ট্র-পরিচালনের উদ্দেশ্যে কর্মবীর হওয়ার শৌর্যবৃত্তি অতীতের ইস্‌লামদর্শনে পাওয়া যায়। গীতার মধ্যেও এই ভাব আছে। কিন্তু মজার কথা এই, উভয় ধর্মের আভ্যন্তরিক সাদৃশ্যের দিকে কোন ধর্ম-আত্মাই লক্ষ্য দেয় না!.....

কিন্তু এর কারণ আছে। হিন্দু ও মুসলমান—ভারত-জাতির এই দুই সম্প্রদায় ধর্ম সম্বন্ধে কেবলি বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকুক্—তৃতীয় পক্ষীয় একটা কৌশলী কপট রাষ্ট্রনৈতিক জাত তা' অবিশ্রাম চেয়েছে। সে জেনেছে, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্যতম ভেদবুদ্ধিটুকু যদি বৃহৎ করে দেখানো যায়—দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য বহুদিন যদি বর্তমান থাকে, তাহলে তার শোষকবৃত্তি বহুকাল চরিতার্থ হতে থাকবে, সাম্রাজ্যবাদ কায়েমী স্বার্থ নিয়ে বহুকাল রাজত্ব করতে পারবে। ভারতবর্ষকে দুইভাগে ভাগ করার দ্বারা সে তাই একদিকে যেমন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আসমানজমীন ফরাক রাখবার চেষ্টা পেয়েছে,—অপর দিকে গোপনে গোপনে ধর্মবুদ্ধির গোঁড়ামির মূলে—স্বার্থবুদ্ধির মূলে—প্রচুর ইন্ধন জুগিয়েছে। ফলে হিন্দু বুঝেও বুঝছে না মুসলমানকে,—মুসলমান বুঝেও বুঝছে না হিন্দুকে। এই যে না-বোঝার দৈন্য—এই দৈন্য জন্ম নিয়েছে শুধু দলগত রাজনীতির দুর্বুদ্ধি থেকে নয়, ধর্মবুদ্ধির গোঁড়ামি থেকেও বটে। এইজন্যে আমাদের দেশের অনেক রাষ্ট্র-নৈতিক মনে করেছেন—ধর্ম যদি দেশ থেকে একেবারে লোপ পায়, ধর্মবৃত্তির কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় জাতীয় সংগ্রামের,—তথা গঠনমূলক কর্ম পরিকল্পনার রণভূমিতে এক উদ্দেশ্য নিয়ে বঞ্চনাবাদীর হীনতম প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে।

ধর্মবুদ্ধির তাই লোপ চাই—দিকে দিকে অনেকেই তাই কলরব তুলেছেন। তারা ইতিহাসের নজিরও তুলছেন—রুষ-বিপ্লবের ইতিহাস। তারা সাম্য-দর্শনের বাণী তুলে বুঝতে এবং বোঝাতেও চাইছেন—সাম্যের পবিত্রবেদী মূলে মানুষ যখন একযোগে দাঁড়াবে, তখন পৃথিবীতে সত্যকার শান্তি আসবে, আসবে মৈত্রী, আসবে সত্যকারের প্রগতি। এই যে সাম্যদর্শন, এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহান, সন্দেহ নেই;—কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ধর্মদর্শনের অন্তর যদি যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায় তবে দেখা যাবে—সত্য যা' ধর্ম, তা মানুষকে স্বার্থ থেকে দূরে থাকতেই বলে, মানুষকে তা' ক্ষমা, প্রেম, মৈত্রী, মুদিতার মহামন্ত্রই শোনায়!

আসল কথা, ধর্ম জিনিষটা মন্দ নয়। ওটা মন্দ হয়ে যায় কয়েকটা স্বার্থান্বেষী ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায়। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধর্মকে অন্য সমস্ত ধর্মাপেক্ষা মহত্তর বলে প্রমাণ করবার জন্য যে-বিকৃত-ব্যাখ্যা দেশে দেশে শোনা যায়, তা' তো ধর্ম নয়, তা অধর্ম; এই অধর্মের বিরুদ্ধেই আজ সাম্যবাদীদের সংগ্রাম—সত্যকারের ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। সাম্য যে যথার্থভাবে চায়, সে এমন একটা ধর্মকে প্রার্থনা করে—যা' শান্তির নিয়ামক, প্রীতির আবাহক, প্রগতির সন্ধানী। প্রকৃত যা' ধর্ম, তার মর্ম উদ্ধার করে যদি দেখি, দেখতে পাব—তা সাম্যবাদীর বিরুদ্ধতা করে না—উপরন্তু তা সাম্যনীতির আত্মাই। ধর্ম সম্বন্ধে মহাত্মাজীর ব্যাখ্যার মর্মকথা এই-ই।

কিন্তু না। তর্ক উঠ্‌ছে। এইখানেই তর্কের শেষ হয় নি; সাম্যবাদী বলে—ধর্মের 'এথিক্যাল দর্শনটা' না হয় ভালো, কিন্তু এই 'এথিক্যাল দর্শনের' দোহাই দিয়ে মানুষ তো 'বকধার্মিক' সেজে বসে থাকতে পারে; এবং এই বকধার্মিককেই তো সমাজ প্রকৃত ধার্মিক মনে করে প্রতিনিয়তই প্রবঞ্চিত হচ্ছে। এই কথা অমান্য নয় এবং অমান্য নয় বলেই বলে থাকি যে, সাধনার দ্বারা বকধার্মিকদের যদি নিস্তেজ করে' দেয়া যায়, যদি সাম্যবাদী সাধকের দল বঞ্চনাবাদী বকধার্মিকদের শাস্তি ও সৎকর্মের প্রভাবে কল্যাণের পথ আকর্ষণ করতে পারেন, তাহলে বুঝবো, সাম্যধর্মীরা ধর্মরক্ষণের কাজই গ্রহণ করেছেন। "ধর্মের রক্ষার জন্যে, ধার্মিকদের পরিত্রাণের জন্যে, যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাবের" যে বাণী গীতায় পাওয়া যায়, সেই রূপকবাণীর তো এই অর্থ নয়, যে ভগবান স্বয়ং পৃথিবীতে এসে, কল্কিরূপে আগমন করে', সব মিথ্যা ধ্বংস করে যাবেন! "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই বাণীর প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, যে, ধর্মের নামে যখন অধর্ম আপনার স্বার্থসিদ্ধি করতে সুরু করবে, তখন উদার মানুষের আদর্শ-আত্মাই জাগরিত হয়ে যুগে যুগে ধর্ম ব্যাখ্যার পরিবর্তন সাধিত করবেন। সাম্যবাদী যদি যথার্থভাবে সাম্যবাদে বিশ্বাস রেখে মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি, মানুষের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম সৌহার্দের বুদ্ধি জাগরণে সাধনা-তৎপর হয়, তবে এই কথাটাই সত্য হয় যে "সবার উপরে মানুষই সত্য"; এই ধর্মবুদ্ধিকে জাগরিত করতেই তার আবির্ভাব।

ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার জন্যে ধর্ম যদি মন্দ হয়, সুদক্ষ ধর্মের মুখোস পরে' হীন মানুষ অধর্মাচরণ করছে বলে সমস্ত ধর্মটাকেই যদি লোপ করবার প্রয়োজন হয়, এবং লোপ করার সাধু সংকল্পটিকে কর্মে রূপান্তরিত করার জন্যে যদি দুরভিসন্ধিপূর্ণ বহু দুর্নীতির আশ্রয়ও নিতে হয়, তবে সাম্যদর্শনেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কেন না জানি, এহেন ধ্বংসবাদী সাম্যদর্শন ভবিষ্যতে কতকগুলি হীনচেতা মানুষের স্বার্থপরতায় আরো বিকৃত হবে; অনাগত মানুষের দল সমগ্র সাম্যদর্শনটাকেই ক্রমশঃ ভুয়ো বলে' দূর করে' দিতে চাইবে। আমার কথার মর্ম হচ্ছে এই, সাম্যবাদটা আসলে যেমন অত্যন্ত উচ্চ, ধর্মবাদটাও তেমনি অত্যন্ত মহান। ধর্মটা যেমন কতকগুলো শোষকের স্বার্থপরতায় বিকৃত বলে মনে হয়েছে, কালে নিশ্চয়ই এমন দিন আসবে, যেদিন সাম্যবাদের দোহাই দিয়ে—বাহ্যতঃ সাম্যবাদের সুর ধরে, মানুষ চূড়ান্ত অসাম্যের পাপাচারে মত্ত থাকবে। সেই যুগ যখন আসবে, (আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই আসবে—কেন না, নিত্য পরিবর্তনীয় পৃথিবীতে কোন ismই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিতে পারবে না—এবং যে কোন মহান ভাব ও কর্মেরই প্রতিক্রিয়া আছে) তখন মানুষ, যারা যথার্থ সাম্যবাদীদের অসীম ঔদার্যকে অনুসরণ করতে অক্ষম থাকবে, তারা সমগ্র সাম্য-ধর্মটাকেই দূর করতে চাইবে। বলবে: সাম্যবাদের ধুয়োটা আছে বলেই, মানুষ বকধার্মিক সাজতে পারছে। বলবে—এই 'বাদ'টাকে বাদ না দিলে কে সত্যকারের সাম্যধর্মী, কে নয়, বোঝা যাবে না।

আসল কথাটা তাহ'লে আমি কি বলতে চাইছি? আমি বলতে চাইছি—আদিমকালের ঋষিবৃন্দ (মানবপ্রেমের সাধনায় যাঁরা আধুনিক কালের যথার্থ সাম্যবাদীদের তুলনায় কোন অংশে হীন নন) যে ধর্মবৃত্তির স্পন্দনকে অনুভব করে

—অহিংসা, মৈত্রী, মুদিতার অপূর্ব নীতিদর্শন সৃষ্টি করে-ছিলেন—তা সত্য সত্যই ভালো, এবং তাই হচ্ছে আসল ধর্ম। তাকে অন্তরে জাগাবার জন্যে সাধনা চাই, আন্দোলন চাই। ধর্মের যে সংস্কার, হীন আচারবিচার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আজ দেখা দিয়েছে,—বোঝা চাই এবং বোঝান চাই, যে তা' সত্যকারের ধর্ম নয়, তা অধর্ম। গোঁড়ামি ত্যাগ করে', ব্যক্তিগত তুচ্ছ মতামত ত্যাগ করে' গভীরভাবে এই সত্যকে উপলব্ধি করা চাই—ধর্ম আমাদের যা শেখায়, তা সত্য, তা শিব, তা সুন্দর। আমাদের হৃদয়ের উচ্চতম যে সমস্ত প্রবৃত্তি, যা' স্বার্থহীন, যা' লোভহীন, যা প্রবুদ্ধ বুদ্ধজীবনের মতো উদার ও আলোকময়—তাকে জাগ্রত করার সাধনাই হচ্ছে ধর্মসাধনা। সেই ধর্মে যে দীক্ষিত,—সে মুখে কিংবা কলমে ঈশ্বরে অবিশ্বাসও যদি প্রচার করে, তবুও এই বুঝতে হবে যে, তার কর্ম, তার প্রেম, তার সংবুদ্ধি ও উদার-হৃদয় এমন সত্যের ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা দিতে চায়—যা' ঈশ্বর ছাড়া কিছু নয়। ঈশ্বর বলতে আমরা, মানুষরা, কি আর বুঝি! আমাদের অন্তর যাকে বলে সুন্দর, যা মঙ্গল; যা আমাদের চেতনাকে করে শুদ্ধ, আনন্দপূর্ণ, তাই তো ঈশ্বর। ঈশ্বর বলতে তো আমরা শান্তিময় পবিত্র ঔদার্যকেই বুঝে থাকি। এ-সবকে বিকশিত করা-ই তো ধর্ম। ধর্ম-সাধনার আবার হাতী-ঘোড়া কি আছে? এই ধর্ম, এই সত্য-সাধনাকে মহাত্মা আবাহন করেছেন আমাদের তরুণ-জীবনে। যে তরুণের হৃদয়ে এটা প্রতিভাত হয় নি—সে মুখে যত বড় কথাই বলুক না কেন,—রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমুদয়ের সমাধানের জন্যে বিশেষ রকমের উদ্যম প্রদর্শন করুক না কেন, অন্তর থেকে তার স্বার্থবুদ্ধি কিছুতে লোপ পাবে না। প্রকৃত ধর্মবুদ্ধির ক্ষমতাই হলো এই, তা' ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, অন্তর থেকে স্বার্থবুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়; আমাদের অন্তরের সুকুমার সুমহানবৃত্তিগুলিকে জাগরিত করে। ধর্মবৃত্তিটা তাই হলো একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা বাইরে প্রচারের ব্যাপার নয়। আত্মিক সাধনার দ্বারা এটা সবার অন্তরীক্ষে অন্তর্লোকে সূর্যের মত প্রতিভাত হয়—কিন্তু এই সূর্যের প্রতি শ্রদ্ধাভাব যদি না থাকে, এর প্রতি বিশ্বাস যদি না রাখি, তবে কি করে এটা জাগতে পারে? নিজে হওয়ার মূলে এই সূর্যেশ্বরের প্রেরণা আছে। তরুণ-ভারতে এই সূর্যেশ্বরকে আবাহন করেছেন মহাত্মাজী।

ধর্মের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়ায়, তারা ধর্মের আসল মর্মটা বোঝে না বলেই দাঁড়ায়। ধর্ম কিছুতেই সংকীর্ণ নয়,—মহাত্মা জীবন দিয়ে এটা বুঝিয়ে গেছেন। বুদ্ধি এবং আবেগ দিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের ছাত্রতরুণদের নিশ্চয়ই আজ উপলব্ধি করতে হবে: "লোকে ধর্মকে যে সকল দোষে দোষী বলে, যে-সকল দোষে ধর্ম দোষী নহে। কোন ধর্মই কখন মনুষ্যের উপর অত্যাচার করে নাই, কোন ধর্মই ডাইনী অপবাদ দিয়া স্ত্রীলোককে পুড়াইয়া মারে নাই, কোন ধর্মই কখন এতদ্বিধ অন্যায় কার্য্যের পোষকতা করে নাই। তবে লোককে এ সকল কার্য্যে উত্তেজিত করিল কিসে? কূট রাষ্ট্রনীতিক মানুষকে এই সকল অন্যায় কার্য্য করাইয়াছে, ধর্ম কখনই নহে। আর যদি ঐ কূট রাষ্ট্রনীতি ধর্মের নাম ধারণ করে, তবে তাহাতে দোষ কাহার?" [মহাপুরুষ প্রসঙ্গ]

পূর্বে বলেছি, বিবেকানন্দের কথার ধুয়া ধরে আবার বলি—ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত স্বার্থবুদ্ধি জয়ী করবার জন্যে ধর্মের মুখোস পরে মানুষ এতদিন যে আচরণ করেছে—তা ধর্মাচরণ নয়, অধর্মাচরণ। এই অধর্মাচরণের বিরুদ্ধে যে-তরুণ সংগ্রাম করবে—সে একদিকে যেমন ধার্মিক, অপরদিকে তেমনি সত্য-সাধক-সৈনিক-ও বটে। তরুণ-জীবনে প্রকৃত ধর্মকে যদি স্থান দিতে পারি, তবে অধর্মের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অধর্মাচারী রাজনীতির বিরুদ্ধে তথা শোষক তন্ত্রী রাষ্ট্রনৈতিক জাতের বিরুদ্ধে, আমাকে লাগতে হবে—এই লাগাটাই হবে ধর্মের সংগ্রাম। প্রকৃত ধর্ম যেখানে অমর্য্যাদাপ্রাপ্ত, যেখানে মানুষ মানুষের মত ব্যবহার না পেয়ে পশুর মত পায় ব্যবহার, জাতকে জাত যেখানে নির্মম অনাচারের অগ্নিদাহনে মরে দগ্ধ হয়ে যায়—সেখানে ধর্মকে যে জানে, সে "ধর্ম সংস্থাপনার্থায়", "পরিত্রাণায়

সাধুনাং' এবং "দুষ্কৃতাম্ বিনাশায়" অগ্রসর না হয়ে পারবে না। এই যে ধর্ম, এই ধর্ম তাকে ভেদবুদ্ধি ভুলিয়ে দেবে,—সে রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামে অগ্রসর না হয়ে পারবে না—মহাত্মার মতই সে জানবে—ধর্ম-সমরে যদি প্রাণ যায় সে মরবে না; সে অমর হবে।

ধর্ম তাই চাই, ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা চাই। ধর্মের কুসংস্কার ত্যাগ ক'রে, ভ্রান্ত-আচার বিচার ত্যাগ করে', তার প্রকৃত মর্মোদ্ধারে সাধনা করা চাই-ই চাই। তরুণ-জীবনে এই ধর্মের অনুশীলনের অত্যন্ত প্রয়োজন। একে বাদ দিলে অন্তর জাগবে না—অন্যায়কে অন্যায় বলে' মনে হবে না। যদিই বা হয়—অন্যায়কে অন্যায় বলতে বলতে শেষে মানুষ গোপনে এমন কাজ করবে,—প্রচার করলে বোঝা যাবে, যার বিরুদ্ধে সে একটু আগে দাঁড়িয়েছে—তারই অনুশীলনে সে রত রয়েছে। এই যে আত্ম-প্রবঞ্চনা, এই যে গুপ্ত-শঠতা, এটা যদি ব্যক্তিগত অধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতিই শুধু করত, তাহ'লে আধুনিক বস্তুবাদী দার্শনিকদের মত বলা নিতান্ত মন্দ হতো না: ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক ক্ষতিবৃদ্ধিতে কিছুই যায় আসে না, (কেননা, ওরা অধ্যাত্মিক ক্ষতিবৃদ্ধি বলে কিছু আছে বলে' বিশ্বাসই করে না—ওরা অনাত্মবাদী) কিন্তু সত্যের দোহাই দিয়ে চরম মিথ্যার যারা প্রশ্রয় দেয়—তারা যে সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি করে—এবং এই ক্ষতি যে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রনীতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করে' মানবনীতিতে প্রতিনিয়ত হত্যা করছে, এই মোটা কথাটা অতি বড় অনাত্মবাদীও স্বীকার করে থাকে। সুতরাং সমাজের দিক দিয়ে, দেশের দিক দিয়ে বলা যায়—মানুষকে অন্তরে বাহিরে সৎ হতে হবে; অন্তরে ধ্যানপ্রেরণায় নিষ্কাম নীতিবাদী এবং বাহিরে স্বদেশ-প্রেরণায় প্রবুদ্ধ কর্মবাদী তাকে হতেই হবে। যতই তর্ক করি না কেন, এ-কথা একান্ত সত্য, জাতীয় কর্মনায়ক যদি হতে চাই' তবে ধর্ম-নায়ক না হয়ে উপায় নেই। আমি আমার মধ্যে যত প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠব—সংযমে, শ্রদ্ধায়, প্রেমে, সেবায়, বৈরাগ্য এবং কর্মপ্রেরণায়,—ততই আমার মধ্যে শত সহস্র সদ্‌ভাবের স্বপ্ন জাগবে,—দেশের, দশের, সমাজের, রাষ্ট্রের কল্যাণে ততই আমি লাগতে পারবো।

তাই মহাত্মা বলেছেন—ধর্ম জিনিষটা একান্ত ব্যক্তিগত: এটা মানি কি না—আমির মধ্যে কেবল আমিই তা' জানি। আমি নিজেকে ফাঁকি দিয়ে, মনকে চোখ ঠেরে' তোমার সর্বনাশ করছি কি না, আমিই জানি। সমস্ত জীবন দিয়ে মহাত্মা আমাদের শিখিয়ে গেছেন: এই জানা মানেই ধর্মকে জানা। এই 'জানা' যার মধ্যে এসেছে,—সে ধর্মকে অন্তরে আসতে মানা কোনদিন করে নি, করবে না।

স্বাধীন স্বদেশে স্বাধীন তরুণ-জীবনে ধর্ম চাই-ই চাই; নূতন ধর্ম। এমন ধর্ম চাই, যা' হিন্দুর একার নয়, মুসলমানের-ও নয়, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সী, কিংবা খৃষ্টানেরও নয়—কারুর নয়; তা' বিশ্বভারতের,—তা' সমস্ত মানুষের। এই ধর্ম যে সাম্য-ধর্ম, সন্দেহ নাই, কিন্তু এ-সাম্য-ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে প্রতিনিয়তই জাগ্রত হয়ে আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রেখে' যে উপায় নেই। আত্মা নেই? আচ্ছা,—চিত্ত? চিত্ত-ও একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া? আচ্ছা, সেই প্রক্রিয়ার প্রতিই দৃষ্টি রাখো। আমরা, তরুণেরা, 'নাম' নিয়ে, 'শব্দ' নিয়ে মারামারি না করে, এই দৃষ্টি রাখবো—সাম্য-ধর্মের কথা যে বলি, তা সত্য সত্যই বলি তো? বিশ্বমৈত্রীর সত্যে সত্যসত্যই আমাদের আস্থা আছে তো? মুখে এক বলে, মনে অন্য কিছু করবার অভীপ্সা আমাদের নেই তো? "মন মুখ এক করা"র ধর্ম-বাণী আমরা মানি তো শয়নে স্বপনে? এই যদি মানি—তবে, শব্দ নিয়ে মারামারি করো না, বলো—আমরা আত্মসংযমী,—বলো, আমরা সাম্য-ধর্মী, বলো আমরা মানবের সখ্য চাই, আমরা মহামানবধর্মী। বলো—আমরা, এই ধর্ম বীররাই, জাতির কল্যাণে বিশ্বের কল্যাণে কর্মবীর, ভাববীর হতে পারি।

এই ধর্মবীর, এই কর্মবীরদেরই মহাত্মা আহ্বান ক'রে ছিলেন আমাদের স্বাধীন স্বদেশে। আজ স্বর্গে গিয়েও তিনি প্রীতিভরে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছেন আকুল প্রত্যাশায়। তিনি মন্ত্র গাইছেন অনন্ত আনন্দে।

তিনি বলছেন, তুমি জাগো তোমার মধ্যে, তুমি জাগো তোমাদের মধ্যে। উদার আকাশের মত হে উদার, হে প্রসন্ন সর্বত্যাগী ধর্মনিষ্ঠ, জাগো তুমি। জাগাও দেশ, জাগাও বিশ্বপৃথিবী :

Lover divine and perfect Comrade,
waiting content, invisible yet, but certain,
Be thou my God.

Thou, thou, the Ideal man, fair, able,
beautiful, content and loving, complete
in body and dilate in Spirit, Be thou
my God.

All great ideas, the races' aspirations,
All heroisms, deeds of rapt enthusiasts,
Be ye my Gods.

বাস্তব ও তুমি

উপেন্দ্রনাথ সমাজদার—প্রথম বর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

আজ যদি হাসো তুমি
মনে হয় এ তুমিই নও—
তোমার এ হাসিটুকু বিকট ধূসর!
তুমি ত সোহাগ ভরা সখী নও আর,
পৃথিবী দেখে না স্বপ্ন তোমার নয়নে
তব তপ্ত কপোলের বিহ্বল পরশে
বিভ্রান্ত হয় না আজ প্রজাপতি দল।
তোমার কিংশুক কর অঙ্গুলি সঙ্কেতে
মুকুলেরা গান গেয়ে ওঠে না ত জেগে।

তুমি আজ কাঁদো
কাঁদো ওগো মোর স্বাভাবিকা,
তোমার মালক হতে বসন্তের চপল বাতাস
নিয়ে যাক্ ধূলি দৈন্য আর দীর্ঘশ্বাস।
দীর্ঘশ্বাস,—এই দীর্ঘশ্বাস—কত রাতে
কত তপ্ত চৈত্র দিনে মধ্যাহ্ন গগনে
দোলন দিয়েছে বক্ষ চেলাঞ্চলখানি,
ফুটায়ে তুলেছে চিত্তে কত মৌন বাণী।

আজিকার বসন্তের আলোতে বাতাসে
আমরা দেখি না স্বপ্ন বিহ্বল আবেশে—
বসে নাই মুখোমুখি বাষ্পাকুল মোহে।
আজিকে নেমেছে ঝড়
আকাশ হাসিছে অন্ধ ধূলির প্লাবন
যতদূর চাই, চেয়ে দেখি তুমি কাঁদো,
কাঁদে সব শতাব্দীর অন্ধকার তলে,
আরো দূরে ফাগুনের ফুলের মিছিল
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্টহাসে।

রঙীন সে দিনগুলি
আজ যদি মরে গিয়ে থাকে
এসো তবে দুইজনে বাঁধি এই পণ
নতুন বিবাহ হোক অগ্নি সাক্ষী করে
চল আজ ছুটে চলি পথহীন পথে
চলতি পথের রেখা পায়ে পায়ে মুছে
চল ছুটে বিশ্ব মাঝে হাওয়ার মত,
সভ্যতার অপলাপ মিথ্যা অভিনয়
এর মুখে দিয়ে যাই মুঠি মুঠি ছাই
তারপর নিঃসীমেতে পুড়ে হই শেষ।
মোদের সে অগ্নি-অভিযানে
সাড়া কি দেবে না আজ কেউ
যাবে না কি বসন্তের একটিও পাখী?

নতুন প্রাণী

বীথি সেন—প্রথম বর্ষ, সাহিত্য

শুয়ে আছি বাড়ীর পেছনে একটেরে ঘরটাতে। চম্‌কে দেখি চেয়ে ছাদের কড়ির ফাঁকে এসে বসেছে সৃষ্টির আদি কালিদাসের হর-পার্বতী—ছোট একজোড়া চড়াই পাখী, ছাদের ছায়ায় তারা বাসা বাঁধল নিখুঁতভাবে ছোট ছোট খড়-কুটো দিয়ে। তারা রচনা করে নীড়, আর এগিয়ে চলে ভবিষ্যৎ দিনকে গড়ে তোলার পথে। মুখোমুখি ব'সে তারা গ'ড়ে তোলে খুসীতে ভরা তাদের অনাগত সুখের সংসারকে। আমার ভাল লাগে তাদের বিশ্রম্ভালাপ—তাদের কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ। আমি সাহায্য করছি তাদের নীড় রচনায়—ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে রেখেছি ছোট ছোট কাঠি আর বিচালীর টুকরো—তারা ঘর বেঁধেছে তাই দিয়ে। তাদের ঘরে আমি অনুভব করি আমার স্পর্শকে। আমি তাদের ঘিরে রেখেছি আমার আশ্রয়ে, বাড়ীর পোষা বিড়ালের শ্যেন দৃষ্টি থেকে—সে চেয়েছে তাদের সুখের সংসার ভেঙে দিতে। আমার ভাল লাগে পরস্পর-মুখী পাখী দু'টিকে—তাদের আমি ভালবেসেছি।

কিছুদিন পরে, তারা নির্ভীক হ'য়েছে আমার কাছে, তারা আমাকে চিনেছে। আমি তাদের চিনেছি। আমি অভ্যস্ত হ'য়েছি তাদের দেওয়া-নেওয়া খেলাতে। আমার কাছে আজ তারা প্রাচীন।

হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম ভেঙে শুনি একটা নতুন আওয়াজ। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখি ছোট্ট একটা পাখীর ছানা। তার গায়ে অজ্ঞাত জগতের চট্‌চটে রস আর অচেনা গন্ধে গা আমার ঘিন্‌ঘিন্‌ করে ওঠে। এ পৃথিবীর কাঠিন্য আজও তাকে ঘিরে ধরেনি। তার চিন্‌চিনে গলার স্বরে নেই এখানকার কর্কশতা।

এদিকে কালের চাকায় ভাঙন ধরে ওদের বাসায়। সাজানো খড়-কুটো বেরিয়ে আসে এদিক-ওদিক থেকে। নিঃসহায় শিশুর গায়ে তারা ফোটে—ব্যথা পায় নতুন জীবটা। নিঃসম্বল পাখীর ছানাটা কেঁদে কেঁদে দিন কাটায়। নিরুপায় বয়স্ক পাখী দুটো বোঝে না অচেনা জগতের প্রাণীর কান্নার অর্থ। গতানুগতিকভাবে তারা আসে, বাচ্চাটাকে খাইয়ে চলে যায় কোথায় যেন।

তারপর একদিন সে পাখীর ছানা বড় হোল। তার জীবনে বসন্ত এল—পাখীর ছানা বুঝল সে কাঁদে কেন, ব্যথা সে কেন পায়, কোথায় তার দুঃখ। অশ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল ঐ নড়বড়ে জীর্ণবাসাটার ওপর।

তারপর একদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি পাখীর ছানাটা উড়ে গেছে কোন্ ভোরে—সূর্যের সোনার জাদু কাঠি যখন ছুঁইয়ে গেছে ঘুমন্ত পৃথিবীর চোখের পাতায়। সে উড়ে গেছে নতুন কায়দায় বাসা বাঁধতে যেখানে ব্যথা নেই, বেদনা নেই, কান্না নেই, আর যাবার সময় ভেঙে দিয়ে গিয়েছে ঐ প্রাচীন, বৃদ্ধ বাসাটাকে। জানলা বাইরে চেয়ে দেখি রাতের পুরোণ অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে সকালের নতুন আলোয়। পৃথিবী জেগে উঠেছে নতুন আশায়, নবীন উদ্যমে।

লেবোরেটরী

নীলিমা গঙ্গোপাধ্যায়—চতুর্থ বর্ষ, কলা বিভাগ

ব্যালকনিতে ছোট ছোট টেবিল পাতা, তার চারপাশে চেয়ার সাজানো। সমস্ত আবহাওয়াটা ঝোরালো ইলেক্‌ট্রিকে ঝলমল করছে। আজ উৎসব—ডাঃ মজুমদারের বাড়ীতে। ফুলের গন্ধে বাতাস ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সিল্ক জর্জেট, ক্রীজওয়ালা দামী শার্ট আর ট্রাউজার, ধুতি পাঞ্জাবী, বেনারসী আর কাশ্মিরী আবরণের ফাঁক থেকে প্রসাধন চর্চিত রুক্ষ মুখ আর সুন্দর মুখ ঝক্‌মক্ করছে। ওরা বসেছে—অনেক মানুষ ওরা; ওরা বসেছে গোল হয়ে, এক একটা টেবিলকে কেন্দ্র করে। ব্যস্ত ভঙ্গীতে ট্রে হাতে নিয়ে উর্দ্দিপরা বেয়ারাগুলো নিঃশব্দে চলা ফেরা করছে। নিয়ে আসছে, কোল্‌ড আর হট্ ড্রিঙ্ক—স্যাণ্ড্‌উইচ্ আর কেক্। ওদের মাঝে বসেছে নববিবাহিতা একটি মেয়ে—বিশেষভাবে ওরই জন্য সাজানো একটি টেবিলে। ওরই জন্যে আজকের এই আয়োজন—এই বিপুল উদ্যোগ। ওকে অভ্যর্থনা করার, ওকে অভিনন্দন জানাবার জন্যেই এতো সমারোহ, এতো সম্মাননা। ওকে ঘিরে অনেক সুন্দর ও সুন্দরী।

ওদিকের ঘরে মোটা পাওয়ারের আলোর নীচে বিলিয়ার্ড খেলা চলছে—অমিত সরকার ওখানে প্রমিনেণ্ট। শুধু ওকে নিয়ে একটু খেলার জন্য আজ প্রচুর হড়োহড়ি। কিন্তু অমিত বেড়িয়ে এলো—খুশীতে মুখচোখ উজ্জ্বল। নতুন বিয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে। চলে এলো—যেখানে ওর স্ত্রী অবাক্ চোখে উৎসবকে উপভোগ করছে। পাশের খালি চেয়ারটা ও দখল করলো। এবার ওর একটা কোল্‌ড ড্রিঙ্ক চাই। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রে হাতে এগিয়ে এলো একটি মেয়ে,—লম্বা, ধারালো চেহারা। কালো—যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি। ডাঃ মজুমদারের কনিষ্ঠা কন্যা—বিনীতা মজুমদার। নির্বাক ঠাণ্ডা চোখে বিনীতা তাকালো একবার অমিত সরকারের দিকে। ওর চোখ উদ্ধত হয়ে এলো, ভুরু কুঁচকে চোখ ফিরিয়ে নিলো তার বৌয়ের দিকে। বৌটি হাসলো—একটা মোলায়েম হাসি। নাঃ—বিনীতা চঞ্চল হলো না—প্রত্যুত্তর দিলো না। তারপর ট্রের উপর থেকে সরবতের গ্লাস তুলে ধরলো ওদের দুজনের দিকে। একটুও হাত কাঁপলো না—একটুও বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করলো না।

দূরে দাঁড়িয়ে বিনীতা দেখতে লাগলো। মেয়েটির রঞ্জিত ঠোঁট দুটি আল্‌গাভাবে গ্লাসটাকে স্পর্শ করছে—একবার, দুবার—আরও একবার—আরও……। একি? অমিতও খেয়েছে। অবশ হয়ে আসছে অমিত; ওর চোখের সামনে সভার সকলের চোখের সামনে মেয়েটির হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেলো ঝনঝন করে। তার চোখ বুজে এলো—ঘাড়টা ঝুঁকে পড়লো একপাশে—হাত দুখানা অসহায় ভঙ্গীতে এলিয়ে পড়লো। অমিত বোবা চোখে দেখছে—ওরই চোখের সামনে ওর স্ত্রী তিলে তিলে মরে যাচ্ছে—অথচ—অথচ ও উঠ্‌তে পারছে না কেন? কেন ও চীৎকার করতে পারছে না? কেন জানিয়ে দিতে পারছে না—খেও না, তোমরা খেও না—সরবতে বিষ মেশানো—তীক্ষ্ণ তীব্র বিষ—বিনীতার প্রতিহিংসার মতো দুর্দান্ত। বিষের ঘোর লেগেছে অমিতের সর্বশরীরে—বিষের বহ্নিশিখায় ও জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। হৈ হৈ করে উঠ্‌লো সকলে—হড়োহড়ি, সব এলোমেলো।

ব্যালকনির একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিনীতা—মুখে সাফল্যের হাসি, চোখে প্রতিশোধের নির্মমতা।

তারপর?

তারপর আর জানেনা বিনীতা। লেবোরেটরীতে ও বসে আছে—সামনে নানারকমের ওষুধ আর বিষাক্ত পদার্থ। চোখের সামনে সমস্ত ছবিখানা ও দেখতে পাচ্ছে, যেদিন ওদের বাড়ীতে উৎসব হবে নববিবাহিত

বিদায় অভিনন্দন

আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ

করকমলেষু

হে শিক্ষাব্রতী !

আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনাকে আজ বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। যে বিদ্যাপীঠ ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া বিরাট মহীরুহের আকারে আজ সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তাহা প্রধানতঃ আপনারই ধ্যান-ধারণা ও প্রচেষ্টার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। আপনি ইহার প্রতিষ্ঠা-দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সুদীর্ঘ ৩২টি বৎসর ইহার সেবায়, ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা জানি, ইহার শৈশব কত দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। না ছিল ইহার একটী নিজস্ব গৃহ, না ছিল তেমন আর্থিক সংস্থান, না ছিল পাঠার্থীর আজিকার মতো এরূপ বিপুল সংখ্যা, অথবা দশের ও দেশের প্রত্যাশিত সহযোগিতা। কিন্তু, সেই অবস্থার মধ্যেও আপনি বিচলিত হন নাই, সর্ব্বদা ইহারই শুভানুধ্যান করিয়াছেন, তিলে তিলে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

হে আচার্য্য !

নিজের সর্ব্বসুখ ও স্বার্থ বর্জ্জন করিয়া শিক্ষাব্রত পালন করাই ছিল আপনার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। মানুষের মন স্বভাবতঃই স্বার্থান্বেষী, কিন্তু আপনি পরার্থেই জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাই আপনি মহান্, তাই আপনি বরেণ্য। বাংলার ব্যাঘ্র আশুতোষ আপনাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মের কিয়ৎ ভার আপনার উপরেই অর্পণ করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আপনি সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। আপনি সার্থক। আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

হে মহাত্মন্ !

আপনার আদর্শ ছিল অনাড়ম্বর জীবনে সর্ব্বোত্তম চিন্তা, আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট পথে আপনার জীবন ছিল আশ্রমিক গুরুর জীবন। আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম্মকেই আমাদের সম্মুখে সৎ ও মহৎ জীবনের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে, নির্ভীক সত্যভাষণে, ছাত্রদের প্রতি গভীর স্নেহ ও অনুকম্পায়, অন্যায়ের প্রতি কঠোর শাসনে, কর্ত্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় আপনি আমাদের এই বিদ্যায়তনে আপনাকে যেভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শুধু আপনার সমকালবর্ত্তীরা নহে, পরবর্ত্তীরাও দীর্ঘকাল আপনাকে স্মরণ করিবে। আমরা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আপনাকে প্রণাম করি।

হে ঋষি !

আপনার চিত্তের ঔদার্য্য ও প্রাণের বিস্তার সাধারণ মানদণ্ডের দ্বারা পরিমিত হইবার নহে। আমরা কর্ম্মচারিবৃন্দ আজ আপনাকে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম। আমাদের সহিত আপনার কোন দিনই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ছিল না, ছিল এক উদার ও পবিত্র স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক। ইহা যে আমাদের কত বড় গর্ব্বের কথা তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ভগবানের নিকট আমাদের আজ কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা,—তিনি আপনাকে আরও দীর্ঘ ও নিরাময় জীবন দান করুন।

ভবানীপুর,
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮।

বিনীত—
আশুতোষ কলেজের কর্ম্মচারিবৃন্দ

অমিতকে নিয়ে। ভবিষ্যৎ থেকে ওর দৃষ্টি ফিরে এলো সামনের টেবিলে। বিষ তৈরী করতে হবে। এমন একটা বিষ, যা খেলে অমিতের বৌ আস্তে আস্তে মরে যাবে—চোখ কপালে উঠ্‌বে, হাত, পা শিথিল হয়ে যাবে; আর অমিত তাই দেখবে অসহায় ভাবে—কিছু করতে পারবে না। তারপর অমিতও মরবে; ঠিক যেমন করে ওর বৌ মৃত্যুর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে।

বিখ্যাত ক্রিকেটার অমিত সরকার—বিনীতার দিদির সম্পর্কে দেওর হয়। খেলা দেখতে গিয়ে ওদের আলাপ। সাদা শার্ট আর লম্বা ট্রাউজার পরা অমিত একটার পর একটা বাউণ্ডারী করছে—আর বিনীতা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাই দেখছে। খেলার মাঠে বিনীতা প্রায়ই আসে। অনেক খেলা দেখেছে, অনেক খেলোয়াড়ও। কিন্তু অমিতের মতো খেলোয়াড় ও দেখেনি। আলাপ হলো ওদের।

বিনীতা মজুমদার—নাম করা এ্যাথ্‌লেট্‌। ওর কলেজে ওই একটি মাত্র মেয়ে, যাকে প্রত্যেক চিনে রেখেছে। অধ্যাপকরা প্রশংসা করেন—ষ্টুডেণ্টরা ঈর্ষা করে—দারোয়ান বেয়ারাগুলো পর্য্যন্ত ওকেই সেলাম জানায়। বিনীতার সমাজে বিনীতা একটি বিস্ময়। নির্মম আর অহঙ্কারী। সব সময়ে খাড়া হয়ে রয়েছে অহেতুক ঔদ্ধত্যে। বিনয় জানেনা—দুর্বিনীতা ও। মা, বাবা, ওর নামটা ভুল করে রেখেছিলেন। কোনখানেই কোমলতা নেই—না দেহে, না মনে। মনে প্রাণে নির্বিকার। কিন্তু তবু ও ফিলসফি পড়ে—পড়ে ইংলিশে অনার্স। সাহিত্য একটা প্যান্‌প্যানানি—তবু সাহিত্যই ও ভালোবাসে। বিনীতার মতো আশ্চর্য্য মেয়ে অমিত দেখেনি।

আর অমিত সরকার ইকনমিক্সে এম, এ। বীরের মতো তীক্ষ্ণ চেহারা। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে। অনর্গল কথা বলে—হো হো করে হাসে অকারণে। বাবার অনেক পয়সা—সেই পয়সায় ও ঘুরে বেড়ায় দেশবিদেশে।

বিনীতা একদিন আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো—সে ভালোবেসেছে। হাস্যকর ভালোবাসা—যার কোনো অর্থ নেই, যার কোনো মূল্য নেই ওর কাছে—এসেছে ওরই জীবনে। অসাধারণ মেয়ে বিনীতা মজুমদার ভালোবেসেছে একটা সাধারণ ছেলেকে, যেরকম ছেলে দেখা যায় শহরের চারপাশে।

অমিতের সৌভাগ্য—একথা অমিত স্বীকার করে নিঃসঙ্কোচে। বিনীতার মতো অসামান্যা একটা মেয়ে ওকেই পছন্দ করে একথা ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে অমিতের।

ওদের পরিচয় এগিয়েই চল্‌লো। ওরা আলাপ করছে—ট্রামে, বাসে, সিনেমায়, রাজপথে আর ড্রইংরুমে। বিনীতার প্র্যাকটিস নষ্ট হচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে পড়াশুনোর। ঝড় বৃষ্টি আর রোদ মাথায় করে খেলা দেখছে। অপ হাতে রুমাল সেলাই করে উপহার দিচ্ছে। আর অমিতের অফিস কামাই হচ্ছে। অমিত দিচ্ছে ফুল। মা পছন্দ করেন না—বলেন—"আমি এসব পছন্দ করি না বিনু"—বিনীতার ভ্রূক্ষেপ নেই। গ্রাহ্যই করে না ও কোনো কিছু। ওসে একটা মেয়ে, এই কথাটা অকস্মাৎ ও জানতে পেরেছে—এখন ওর উচ্ছ্বাসের সীমা নেই।

একদিন বিনীতা শুনলো, অমিত সরকারের বিয়ে আগামী ফাল্গুনে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলো। চোখের সামনে একাকার হয়ে গেলো সব। আকাশ যেন ঠিক আকাশের মতো নয়—সূর্য্য যেন আর সূর্য্যই নয়।

—'তুমি সত্যি বল্‌ছো দিদি?'—চোখ বড়ো করে তাকালো দিদির মুখের দিকে।

—'সত্যি রে!' দিদি বললো। —'আমি তোর সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলুম অমিতের বাবাকে,—তাঁরা রাজী হলেন না। বললেন, বিনীতা বড়ো কালো। ও মেয়েকে ঘরের বৌ করা যায় না।" —ব্যথিত স্বরে দিদি বলে।

—'কালো? আমি কালো?' —চোখ দুটো রাগে ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠ্‌লো—"আর অমিত? অমিত বুঝি খুব ফর্সা? এ্যা!" —অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো বিনীতা। —"আচ্ছা দেখা যাবে ওর বৌ কোন জাতীয় সুন্দরী হয়?"

লেবোরেটরী

—"না বিয়ে করলো, তো ভারী বয়ে গেলো"—দিদি সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে।

—"বয়ে গেল? তুমি কি বলছো দিদি? একি একটা উড়িয়ে দেবার কথা?"

—বিনীতা আকাশ থেকে পড়ে। —"অমিত নিশ্চয় মত দেয় নি, ওর বাবা জোর করে বিয়ে দিচ্ছে—তাই নয়?" —বললো বিনীতা, নিজেকে একটা কৈফিয়ৎ দিলো যেনো।

—"না, অমিত নিজে ইচ্ছে করেই বিয়ে করছে। ও বলেছে, বিনীতাকে নিয়ে শুধু একটু খেলা করলাম—তা বলে ঐ কালোকে বিয়ে করতে হবে?"—দিদি বললে। —"আর তাছাড়া বাবাকে সে অমান্য করতে পারবে না।"

—"অমিত বললো? অমিত বলেছে একথা?"—বিনীতার পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। প্রকাণ্ড একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ো থেকে ও যেন হঠাৎ সমতল ক্ষেত্রে পড়ে গেছে—বিশাল অরণ্যের মাঝে যেন অকস্মাৎ ও হারিয়ে গেছে।

—"তুই কাঁদিস না"—বললে দিদি।

—"আমি কাঁদবো?"—ঝরঝরিয়ে শুকনো হাসি হাসে বিনীতা। কান্না সম্বন্ধে ওর কোনো conceptionই নেই। ওর অহঙ্কারে আঘাত লেগেছে। সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত আনন্দ একটি আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ও কাঁদবে না বোকার মতো, আর পাঁচটা মেয়ের মতো। ও জীবনেও কখনও কাঁদেনি। পাগোল্ হবে না বিনীতা। প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ নিতে হবে।

ঢুকলো গিয়ে বাবার লেবোরেটরীতে। সরিয়ে রাখলো Plato, Hume আর শঙ্করাচার্য্যকে—ছুঁড়ে ফেলে দিলো রবীন্দ্রনাথ Shelley আর Keats। বলতে পারেছে কেউ, কেন এমন হয়? কেন একজনকে bereave করে আর একজন সুখী হয়? উত্তর দিতে পারে—Plato, Hume আর Berkeley! বলতে পারে রবীন্দ্রনাথ, ব্রাউনিং আর Shakspeare?—কি হবে ওসব পড়ে, ছাই আর ভস্ম। টেনিস র‍্যাকেটটা ওকে উপহাস করছে। চোখ ফিরিয়ে নিলো ও। অমিতই যদি চলে গেলো তো, কি দাম আছে খেলার—কিসের অর্থ Shelley আর Keatsএর।

ও চলে এলো সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে। মোটা মোটা বই খুলে নানারকম ওষুধবিষুধ নিয়ে ও গবেষণা করতে লাগলো। একটা বিষ তৈরী করতে হবে—ওর প্রতিহিংসার মতো তীব্র আর তীক্ষ্ণ—ওর রাগের মতো প্রচণ্ড আগুন। ভীরু অমিত—কাপুরুষ! বাবার সুপুত্র! বিনীতার আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছে—ওর জীবনের প্রথম কোমলতা অপমানিত হয়েছে। হিংস্র হয়ে উঠেছে ও তাই; বন্য জন্তুর মতো খাঁটি আর নির্বোধ হিংসায় হিলহিলিয়ে উঠেছে। আর কটা দিন আছে হাতে। অমিতের বিয়ে হবে। তার কয়েকদিন পরেই বিনীতার বাবা পার্টি দেবেন বাড়ীতে, ওদের দুজনকে প্রধান অতিথি করে! একথা বিনীতা শুনেছে। অক্লান্ত উদ্যোগ চলেছে তাই। সেই পার্টিতে নিজে হাতে ও বিষ পরিবেশন করবে ওদের।

ওর সূর্য্য খেলার মাঠ ছেড়ে চলে এসেছে লেবোরেটরীর মধ্যে।

মেজদা ধমক্ দেয়—"কিরে তোর না কদিন পরেই Test পরীক্ষা? আর তুই দিনরাত এখানে বসে রয়েছিস?"

—"অনার্স ছেড়েছি আর পাশকোর্সের পড়া পরীক্ষার আগের দিন পড়লেই চলবে।" —যন্ত্রচালিতের মতো উত্তর দেয় বিনীতা। আবার মাথা ঝুঁকিয়ে কাজে মন দেয়—ভয়ঙ্কর একটা experiment চলছে। বিনীতাকে প্রতারণা করলে কি হয় তা বুঝিয়ে দেবে। দিনের পর দিন চলে। চেয়ারে বসে বসে পিঠের শিরদাঁড়া টনটন্ করে—তবু ওর বিশ্রাম নেই।

সুকন্যা এলো। ঢুকলো গিয়ে লেবোরেটরীতে—যেখানে বিনীতার অদ্ভুত experiment চলছে। বিনীতার গল্প ও জানে—বিনীতাই ওর সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। দাঁড়ালো বিনীতার সামনে। বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে উঠ্‌লো

বিনীতা—"তুই সুকন্যা? জানিস্ অমিতের বিয়ে? সেই ক্রিকেটার অমিত সরকার?"

—"তাই নাকি?" মুখে হাসি টেনে এনে সুকন্যা বললো। ও জানে বিনীতা কি করছে। অমিত আর অমিতের বৌএর জন্যে বিনীতা কি উপহার তৈরী করছে—সুকন্যা তাই দেখছে। টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের গ্লাস আর টিউবগুলো সরিয়ে সুকন্যা বসলো। —"কিরে, তোর চেহারা এমন হয়েছে কেন?" —বললো ও।

—"চেহারা নিয়ে কি হবে?" বিনীতা উত্তর দেয়।

—"কিছু হবে না?"—হাসলো সুকন্যা—"তাহলে এ বিষ তৈরী করছিস কেন—কি হবে?"

—"মারবো—অমিত আর তার বৌকে।" নির্বিকার মুখে জবাব দেয় বিনীতা। সুকন্যার মনে পড়ে যায় ব্রাউনিংএর "লেবোরেটরী" কবিতাটা। মেয়েটিকে ব্রাউনিং পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে। মেয়েটি বিষ চায়—না, নিজের জন্য নয়। যারা তাকে বঞ্চিত করেছে তাদের জন্য সে বিষ চায়। সে নির্মমভাবে হেসে বলেছিল, তারা, অর্থাৎ সেই নব পরিচিত ছেলেটি আর মেয়েটি মনে করছে সে ভগবানের কাছে তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছে? নাঃ—ও চার্চের পবিত্র গণ্ডীতে নেই—ও রয়েছে মৃত্যুর সামনে। বলছে—I am here। বিনীতাকে দেখে সুকন্যার ঠিক সেই কবিতাটাই মনে পড়ছে। বিনীতা প্রার্থনা করছে না অমিতের জন্য, অমিতের বধূর জন্য। ভগবানকে ও জানে না। ও চলে এসেছে নিষ্ঠুর কাঠিন্যে। ও যেন বলছে—I am here—এই মৃত্যুর উদ্ধতিতে। সাহিত্য ওকে বোবা sentiment দিয়েছে—খেলার মাঠ ওকে নিষ্প্রাণ, নির্মম করেছে। চোখের সামনে নৃশংস একটা ছবি দেখে সুকন্যার ভয় করছে। বললো—"তুই সত্যি ভালোবাসিস্ অমিতকে?"

—"নিশ্চয়—একশোবার!" —জোর দিয়ে বললো বিনীতা।

—"মিথ্যে কথা। সত্যিকারের ভালোবাসলে আঘাত করা যায় না।" সুকন্যা যুক্তি দেখালো।

তবে? তবে কি মিথ্যা? নিশ্চয় ভালোবাসে না বিনীতা। হ্যাঁ, বিনীতা শুধু মুগ্ধই হয়েছিল—infatuation। ভালোবাসা মনের বিকার।

—"নাঃ—আমি ভালোবাসি না—কখনও বাসি না।" —আরও জোরে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বলে বিনীতা।

—"তাহলে তো, তোর এসব করার কোনো মানেই হয় না। ভালোই যদি না বাসিস্ তাহলে সে বিয়ে করলো কিনা তা নিয়ে তোর অতো মাথাব্যথা কেন?" —বলিষ্ঠ যুক্তি দেখায় সুকন্যা। —"তাছাড়া তুইও sportsman—জানিয়ে দে অমিতকে যে তুইও নেহাৎ খেলাই করেছিস—তোর দুঃখ নেই।" বললো ও।

মিথ্যা! এতো উদ্যোগ সবই বৃথা। সুকন্যার কথা অস্বীকার করতে পারছে না ও। খেলাই তো? জীবনটা খেলার মাঠ। একটা ভয়ঙ্কর খেলায় হেরে গেছে বিনীতা।

—"কিন্তু এতদিন যা জানলাম তা মিথ্যা!" —ম্রিয়মান হয়ে বললো বিনীতা।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো সুকন্যা—বললো—"মিথ্যা নয়—আজকের সূর্য্যও সত্য—কাল যে সূর্য্য উঠবে তাও সত্য।"

অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিনীতা। অনেক সূর্য্য ওঠে। আজকের সূর্য্য অস্ত গেলেও কাল সূর্য্য উঠবে, নতুন করে—নতুন রূপে—আকাশে লাগবে নতুন রং। আজ যদি সব বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল হয়ে যায়—কাল আবার নতুন করে জমাট হবে। Every morrow—a vision of hope. কি সুন্দর কথা—Merriamকে ধন্যবাদ। কি বোকা বিনীতা—কি ভয়ঙ্কর idiot!

আজকের আকাশ কালো—কালকের আকাশ রূপোলী হয়ে উঠবে; To-morrow and to-morrow and to-morrow—অনাগত পরিপূর্ণতার আশাতেই মানুষ এগিয়ে চলেছে। Shakspeareকে ধন্যবাদ। আজকের দুঃখ, কাল কি ছেলেমানুষীই মনে হবে।

কিন্তু তবু—তবু একটা সুতীব্র বেদনা ওর সমস্ত শরীরে ঝিন্‌ঝিনিয়ে উঠছে। মুখে হাত চাপা দিয়ে বিনীতা বসে

রইল। হাওয়ায় রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে—ওর চেহারাটা কারুণ্যে ছল্‌ছল্‌ করছে। একটা গোঁয়ার ঝড় হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে। সুকন্যা দেখতে লাগলো নিঃশব্দে—আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোখের জল টপ্‌ টপ্‌ করে ঝরে পড়ছে—উত্তপ্ত অশ্রু মুক্তোর মতো ঝিক্‌মিক্‌ করছে। বিনীতা কাঁদছে—ওর জীবনের First humility of tears. কোলের ওপর ওর মাথাটা টেনে নিলো সুকন্যা।

আমি শ্রীমতী সুকন্যা—গল্পটা বললাম। গল্পটা নেহাৎই মামুলী। কিন্তু এই গল্পেরই উপসংহারে আমি বসে রয়েছি লেবোরেটরীর মধ্যে একটি টেবিলে। কয়েকদিন পরেই অমিত সরকারের সঙ্গে আমার বিয়ে। আমার ব্যাগের মধ্যে নিমন্ত্রণ পত্র রয়েছে। কিন্তু বার করতে পারছি না। আমার দুহাতের ওপর মুখ রেখে বিনীতা কাঁদছে—নিঃশব্দ কান্না। ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে বারে বারে। সেই অসামান্য মেয়েটির উষ্ণ অশ্রু পড়ছে আমার হাতের ওপর।

দুফোটা চোখের জল

নীরদবরণ চক্রবর্তী—তৃতীয় বর্ষ, কলা

রাতের আঁধারে দেশ ছেড়ে যায়
চুপি চুপি কত লোক,
চোখে ঝরে জল, ভয়ে কাঁপে বুক
পবনে শিহরে শোক।

সাত পুরুষের সুখে-দুঃখে আঁকা
সোহাগমেশানো মাটি,
বিদায় বেলায় ছাড়িতে না চায়
দরদ যে তার খাঁটি।

শোনে না মানুষ কাতর-কাকুতি
মাটির মনের কথা,
গুমরিয়া মরে হিয়ার মাঝারে
গোপন গহন ব্যথা।

অজানার পানে যাত্রা তাদের
নিশুতি রাতের পথে,
সব ছিল যার সবহারা হ'য়ে
চলেছে বিদায়-রথে।

নিজ দেশে আজ মা'র চোখে জল,
বেঁচে থাকা হ'ল ভার,
কালের গতির ঘুরেছে যে মোড়,
নাহি সে জীবন আর।

চোরের মতন চুপি চুপি চলা
চুপি চুপি থাকা ঘরে,
জীবন মরণ সমান করিয়া
কী করি পরাণ ধরে।

মরমে মরিয়া দেশ ছাড়ে তাই
বেদনা-বিধুর প্রাণ,
থম্‌থমে রাত, নীরব, নিঝুম
পেচকেরা গাহে গান।

ভয়ে কেহ তারা দিনে নাহি যায়
পাছে পরে কারো চোখে,
রাতের আঁধারে মুখ ঢেকে তাই
ছুটেছে যে কোন্ লোকে।

আশুতোষ কলেজের সম্মাননীয় অধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ, এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের
কর্ম হইতে অবসর গ্রহণে তদীয় সহকর্মিবর্গের শ্রদ্ধাভিনন্দন

মাননীয় মহোদয়,

আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষরূপে যথোচিত যোগ্যতার সহিত কর্ম সমাপ্ত করিয়া আজ আপনি অবসর গ্রহণ করিতেছেন ; শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আজ আমরা আপনার সুদীর্ঘ কর্মজীবনের কীর্তি-কথা-সমূহ স্মরণ করিতেছি।

বিপুল এই বিদ্যায়তনের যশ ও প্রতিষ্ঠার কথা আজ শুধু কলিকাতায় নহে, কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হইয়াছে ; কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা সুদীর্ঘদিন এই শিক্ষায়তনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারা জানেন—প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত কত বাধা ও বিপত্তির স্রোত ঠেলিয়া বর্তমানের এই বিপুলত্বের মহিমায় আমাদের প্রিয় বিদ্যায়তনটি আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কি দুঃখের অমাচ্ছন্ন দুর্দিনে, কি সুখের সূর্যস্নাত শুভমুহূর্তে, হে বরেণ্য বন্ধু, আপনি যথার্থ ভারতীয় গুরুর ন্যায় গীতোক্ত "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"র সৌষম্য, আদর্শ, লক্ষ্য, ধৈর্য ও সাহস লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারত্ব করিয়াছেন।

সাত্ত্বিক-পাণ্ডিত্য-মহিমার শ্রী ও সারল্যে অনাড়ম্বর আপনার জীবন ও চরিত্র—আপনার আচার, ব্যবহার ও কর্মপ্রণালী। আধুনিক সৌজন্যপটু ছদ্মবেশী মিষ্টতা আপনার জীবনের বাণী নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষের নিরাভরণ চারু স্বভাবের উলঙ্গ সাধুতাই আপনার বাণী।

আপনাকে দেখিয়া আমরা সরল জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে অনুভব করিয়াছি—তীক্ষ্ণধী জীবন-বিজ্ঞানের দর্শন মহিমাকে উপলব্ধি করিয়াছি, সনাতন ভারতবর্ষের রুদ্র রুদ্রাক্ষের অন্তরে রক্ষাকবচের শক্তিপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছি।

মনীষী স্যার আশুতোষ মণি চিনিতেন বলিয়াই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাকালে আপনাকেই তিনি স্মরণ করিয়াছিলেন। স্মরণীয় আশুতোষের স্বপ্ন ও সংকল্প আপনার শক্তি ও কর্মপ্রতিভায় আজ চরিতার্থতার গৌরবপথে অগ্রসর হইয়াছে।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল আপনি নিরলসভাবে এই বিদ্যা-নিকেতনের জন্যই অতিবাহিত করিয়াছেন ; বিশ্ববিধাতার আশীর্বাদে যে হৃদয় ও মনীষার আপনি অধিকারী তাহারই বলে চেষ্টা করিলে আপনি বৃহত্তর লোক-সমাজে ও রাষ্ট্রলোকে অচিরেই অমর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন ; কিন্তু সর্বত্যাগী শিক্ষাব্রতীর ন্যায় লোকসম্মানে উদাসীন রহিয়া সবার অন্তরালে শত সহস্র মানুষ গঠনেই নিজেকে নিঃশেষিত করিলেন।

আপনাকে আমরা কোনদিন বিস্মৃত হইব না। আমরা নিশ্চিত জানি, আপনিও আমাদের বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। শয়নে-স্বপনে আপনার আত্মার আত্মীয় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কথা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণে আসিবে।

আপনাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি, গৌরবময় যে ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা আপনার সাধনায় এখানে সম্ভব হইয়াছে, যথোচিত শ্রম, সাধনা ও সাধুতার দ্বারা তাহার মর্যাদা রক্ষা করিব।

আমরা জানি, শুভ-চিন্তা ও শুভ-কার্যে আপনার শুভেচ্ছা ও সহায়তা সর্বদাই মিলিবে ; এই বিশ্বাসে ও এই আশ্বাসে আপনার অবসর-গ্রহণকালেও আমরা নবতর একপ্রকার মিলনানন্দ অনুভব করিতেছি।

অটুট স্বাস্থ্য ও অপরিসীম সুখ-শান্তি আপনার সম্পদ হউক, আপনি শাস্ত্রোক্ত শতায়ুর মহিমময় জীবন যাপন করুন, বিশ্ব-বিধাতার নিকট ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

আপনি আমাদের আত্মীয়োচিত শ্রদ্ধাভিনন্দন গ্রহণ করুন। ইতি—

১৪ই আশ্বিন, ১৩৫৫
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

আপনার গুণমুগ্ধ সহকর্মিবৃন্দ
আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা।

প্রাণ আনচান্, দুরু দুরু বুক,
তবুও তাহারা চলে,
নীরবে বিদায় যেন বলে যায়
সবারে চোখের জলে।

পথ যে তাদের কাঁটা দিয়ে ঘেরা
বিপদেতে বন্ধুর,
বনপথতল, নয়ত সরল,
যেতে হবে বহু দূর।

কোথা যাবে তারা, কী হবে পাথেয়
জানে নাকো তারা ভালো,
এই দেশ ছেড়ে জানে যেতে হবে
না ফুটিতে রবি-আলো।

সাঁসারী আজ পথের পথিক
ডাকে দূরে মরু-মায়া,
চারিদিকে যেন ঘনায়ে এসেছে
মৃত্যুর কালো ছায়া।

কাঁদে যারা যায়, কাঁদে ভিটে মাটি
কাঁদিছে বিশ্বলোক,
নিশীথ-সমীর যেন কেঁদে যায়
জমাট বেঁধেছে শোক।

ঝরিছে মুকুল, পাতা ঝরে যায়,
ঝরে যায় ফুল-দল,
তাহাদের সনে রাখিও আমার
দুফোটা চোখের জল।

বর্তমান বাঙলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ

পি. কে. ভট্টাচার্য—প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন—যে জাতির অতীত নাই সে জাতির ভবিষ্যৎও নাই। সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালীর গৌরবময় অতীত রহিয়াছে। আমাদের আছে বিজয় সিংহের লঙ্কাজয়, দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সাহিত্যে রহিয়াছে—বঙ্কিম-মধু-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের অবদান। আমরা পাইয়াছি চিত্তরঞ্জন নেতাজীর মত দেশপ্রেমিক; জগদীশ-প্রফুল্লচন্দ্রের মত গবেষণা বৈজ্ঞানিক—আমাদের না আছে কি?

যে জাতির অতীত এত গৌরবময় সে জাতি আজ বিধাতার অভিশাপে দুর্দৈবে পড়িয়াছে। রূঢ় বাস্তবের মুখে সে আজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে ব্যস্ত। আধুনিকতার হাতে গা ভাসাইয়া বাঙ্গালী বেশ নিশ্চিন্ত ছিল—অধুনা তাহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। এতকাল সে গোথলের প্রশংসা বাক্য স্মরণ করিয়া অন্ধ-প্রসাদ লাভ করিয়াছে—কিন্তু দেখে নাই নিজস্ব স্বরূপকে। বড় দেরীতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন।'

আজ স্পষ্ট দেখিতেছি গোখলের 'বাঙলা' আর নাই। যাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow' বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালীর হিসাব-নিকাশের দিন আজ আসিয়াছে। তাই বাঙ্গালীর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—বাঙলা উত্থান কি অধঃপতনের পথে?

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কিরূপ—ভাল না মন্দ, উজ্জ্বল না অন্ধকার—তাহা নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে কোনদিকে বাঙ্গালী কতটা অগ্রসর হইয়াছে:

বর্তমান বাঙলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ

সাহিত্যই জাতির স্পন্দন। সাহিত্যে বাঙ্গালী কতটা অগ্রসর হইয়াছে? যে বাঙলা সাহিত্যের গৌরব আমরা করিয়া থাকি, যে রবীন্দ্র সাহিত্যের জন্য গর্ব অনুভব করি, তাহাতে বর্তমানের ছোঁয়াচ নাই। ছিল বটে আমাদের রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সে সময় বিগত। রবীন্দ্রোত্তরকালে আমরা কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছি? রবীন্দ্রনাথকে নিয়া আমরা গর্ব করিব সত্য—কিন্তু সে গৌরব ঐতিহাসিক। বর্তমানে গৌরব করিবার মত সাহিত্যিক বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাই না।

ব্যবসায় বাঙ্গালী বরাবর পশ্চাতে ছিল—আজও তেমনি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাবধানবাণীতেও চৈতন্যোদয় হইল না। বাঙ্গালী ব্যবসার ক্ষেত্রে যেই তিমিরে সেই তিমিরে রহিয়া গেল। বাঙলার ছুতার, বাঙলার কামার হাত গুটাইয়াছে; কল ছাড়িয়া হইয়াছে কলের কুলী। দুই-চারিটা দোকান খুলিয়া বেচা-কেনা করাই ব্যবসা নহে—বিদেশের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যবসা করিতে বাঙ্গালী এখনও শিখে নাই। আজও বাঙলার পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়; সেই পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে বাঙলা হইতে লাখ লাখ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। সুখের বিষয় বাঙ্গালী আজকাল ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সুরু করিয়াছে এবং জীবন-বীমা কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে। কল কারখানাও সৃষ্টি হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা আশার বিষয়।

কৃষিকার্যে বাঙলার অবস্থা সন্তোষজনক নহে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাবের কৃষকগণ যেমন পরিশ্রম করিয়া ক্ষেতে সোনা ফলায়, স্বভাবলব্ধ উর্বর জমিতে বাঙ্গালী কৃষক তেমনটি পারে না। আজও বাঙলার কৃষক বৃষ্টির জন্য প্রকৃতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। পৃথিবীর সভ্যদেশগুলিতে কৃষকেরা যখন ট্রাকটার ব্যবহার করিতেছে—আমাদের দেশের কৃষকেরা তখনও মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। আমাদের দেশ দুর্ভিক্ষ-মহামারীর দেশ। খাদ্যাভাবে শত শত নরনারী নিরন্ন—তবু ফসল বাড়ানোর কার্যকরী উদ্যম দেখা যায় না। অধুনা কেন্দ্রীয়-গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'দামোদর-পরিকল্পনা' গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে বাঙলা এবং বিহারের বহু একর জমিতে ফসল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়া বাঙ্গালী অগ্রণী। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জগৎকে কিছু দিবার মত বাঙ্গালী অর্জন করিয়াছে। ইহা প্রমাণ করিয়াছেন স্বামিজী এবং আরও কয়েকজন ধর্মবিদ।

রাজনীতিতে বাঙ্গালী কতটা কি করিয়াছে দেখিতে হইবে। একদিন ছিল যখন বাঙ্গালী সমগ্র ভারতের রাজনীতি পরিচালনা করিয়াছে। আজও সুরেন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রগুরু বলা হয়। অগ্নিযুগে ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী দেশ-প্রেমের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে—তাহা অতুলনীয়। কারাকক্ষের অন্ধকার, দেশপ্রেমিকের বধ্যমঞ্চ, এবং আন্দামানের নির্জন বনভূমি যদি কথা বলিতে পারিত—তবে প্রকাশিত হইত দেশের স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালী কি করিয়াছে, কতটা করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই দুর্যোগময়। বঙ্গ-ভঙ্গের অবিভক্ত বঙ্গ আজ আবার বিভক্ত হইয়াছে। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর প্রভাব নাই; বাঙলার নেতৃবৃন্দ আজ বিচ্ছিন্ন। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্প্রীতির ভিত্তি ধ্বসিয়া ফেলিয়াছে। মোট কথা বাঙলার রাজনৈতিক আকাশে ঘোর তমসা বিরাজমান।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কি? বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার দেখিয়া প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন—এমন চলিলে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু প্রফেসর বিনয়কুমারের মত—পূর্বে যেমনই হো'ক বাঙ্গালী এখন উন্নতির দিকেই চলিয়াছে। আজ যদিও বাঙলার দুর্দিন, কিন্তু দুঃখের পর সুখ, আঁধারের পর আলো—ইহাই ত চিরন্তন নীতি। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে—বাঁচিতে হইবে মানুষের মত। বাঙ্গালী বাঁচিলে বাঁচিবে ভারত।

সৈনিক

কেশব চৌধুরী –তৃতীয় বর্ষ, কলা

সৈনিক, চল লাল পথে
এক সাথে
সঙ্গীন ঘাড়ে লাল হেলমেট্
লও মাথে।
লেফট্ রাইট্ লেফট্
চল, পায়ে পায়ে কমরেড্।
সঙ্কেত ধ্বনি ছইসীল বাজে দূরে—
এক সুরে—
কালো রাত্রির মৌনতা গেছে টুটে
যাও ছুটে।
ঐ প্রান্তরে তোমাদের খুনে শ্যামালিকা যাক্ মুছে
লাল হোক কলেবর।

নাইবা রহিল ইতিহাসে নাম লেখা
কত যে দধিচি ঘুমায়ে রয়েছে হেথা
কেউ কি পেয়েছে দেখা?
ক্ষতি কি সে?
মাটির মানুষ মাটিতে গিয়েছে মিশে।
সেই ভালো,
কোজাগরী চাঁদ যদি দেয় আলো।
সৈনিক, তুমি দেব সন্তান নও
মাটির মানুষ পরিচয় সম্বল।
মৃত্যুর ক্ষণে মেদিনী ওঠেনি কাঁপি
ফেলেনিকো আঁখিজল।
রক্ত তোমার আসেনি যে কেহ নিতে
রয়েছে সাক্ষী মাটির এ পৃথিবীতে।

রং সাইড

দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ—প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

"বাবু একটা পয়সা"—একটা অন্ধ ভিখারী লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে রোজই এমন সময় ফুটপাতের যাত্রীদের কাছে পয়সা চায়! কেউ দেয়, কেউ দেয় না। তার শতছিন্ন মলিন বস্ত্র বার বার ভারতের আসল রূপটাকে প্রকাশ করে দিতে চায়। তার মুখের ম্লান হাসি কাকে যেন ব্যঙ্গ করে বলে—"আর কত নেবে; এখনো কি পূর্ণ হল না তোদের আশা!" রোজই ঐ পথে আনাগোনা করি কখন বা কাজে কখন বা অকাজে। যখন পকেটে কিছু থাকে তখন দিই, কিন্তু বেশী থাকে যখন তখন দিই না। কারণ বেশীর নাকি বেশী প্রয়োজন। তা না হলে কেন ওই নিশিকান্ত চৌধুরি, মনিলাল সেঠের দল লক্ষের উপর আবার শূন্য চাপাতে চায়। এমনি এক আনাগোনার মধ্যে এক বিকালে আসছিলুম আমার সেই পরিচিত পথ ধরে, কিন্তু হঠাৎ একি! এক আর্তনাদ,—তারপর নিস্তব্ধ, পর মুহূর্তে আবার আশে-পাশের জনতার চিৎকার। ছুটে গেলাম রাস্তার মাঝে; রাস্তার এক ধার ঘেঁসে পড়ে আছে এক ছিন্ন ভিন্ন দেহ; রক্তে সমস্ত দেহটা লাল হয়ে গেছে। তারই অদূরে হত্যাকারী এক গর্বিত যন্ত্র দানব।

গাড়ীর দরজা খুলে গেল। এক স্থূলকায় ভদ্রলোক

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার বারংবার।"

স্বর্গীয় অধ্যাপক
অমলকুমার রায়চৌধুরী

স্বর্গীয় অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্ত্তী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সিদ্ধনাথ সেন

বাঙলা সাহিত্য সম্মিতি

১৯৪৮

বসিয়া—(বাঁ দিক থেকে)—বীরেন চৌধুরী (সহঃ সম্পাদক), জ্যোতিষ গাঙ্গুলী, গোপাল ভট্টাচার্য্য (সাধারণ সম্পাদক), অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), অধ্যক্ষ সোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সর্বাধিনায়ক), সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি), অজিত সেন, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস দত্ত।

দাঁড়িয়ে—(বাঁ দিক থেকে)—কেশব চৌধুরী, সরোজ গুপ্ত, তেজেন গুহরায়, সুবীর মজুমদার, চিররঞ্জন সেন, ভোলা দাসদত্ত, সুভাষ বসু, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেরিয়ে এলেন, তারপর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন সেই দেহটাকে। তারপর ছুটি কথা অস্পষ্ট মদিরা গন্ধের সহিত বেরিয়ে এল 'রং সাইড'। এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম এ আর কেউ নয় সেই অন্ধ ভিখারী। এমন সময় এলো পুলিশ। জনতা সরে এলো গাড়ীর পাশ থেকে। কারণ জনগণের রক্ষক ও অসহায়ের সহায় পুলিশ এসে পড়েছে। পুলিশের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হল জানি না। ভদ্রলোক পুনরায় গাড়ীতে উঠলেন, চলেও গেলেন,—কেবল চলে যাবার সময় পুলিশের প্রশংশনীয় কাজের জন্য দিয়ে গেলেন নগদ পাঁচ টাকা। কারণ লোকটা সত্যিই রং সাইডে ছিল। সকলেই চলে গেল। আবার সেই রাস্তা পুনঃ মুখরিত হয়ে উঠল গাড়ী ও মানুষের যাতায়াতে। কিন্তু জগৎ থেকে চিরকালের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল একটি স্বর "বাবু একটি পয়সা"। কিন্তু সত্যিই কি এক পয়সার চিৎকার চিরকালের জন্য মূক হয়ে গেল। না—না—না আবার ওরা আসবে, এমনি করে দাঁড়াবে রাস্তার ধারে, বলবে "বাবু একটি পয়সা"। কিন্তু বেঁচে ওরা থাকবে না, থাকবার অধিকার ওদের নেই কারণ ওরা যে রং সাইডের লোক।

প্রচণ্ড শীতের এক রাতে

পূর্ণেন্দু মল্লিক—প্রাক্তন ছাত্র

প্রচণ্ড শীতের এক রাত।
জনাকীর্ণ এস্‌প্লানেড—
ওরি মাঝে দেখ্‌লাম্
দাঙ্গাহতা কোনো এক নিঃসঙ্গ তরুণী।
তাকে দেখে মনে হোলো—
হয়ত সে আমারি মতন,
দুবেলা-দুমুঠো-খেয়ে-বেঁচে-থাকা-গৃহহ-সন্তান—
আজকে হয়েছে গৃহহারা।
আজ সে কাটায়
কুকুরের মুখ হ'তে কাড়া—
এঁটো-কাঁটা-ভাতে!
দিন রাত তার কাছে এক হয়ে গ্যাছে,
এক হ'য়ে গ্যাছে
আলো আর অন্ধকার!
সামনে মেট্রোয় আর মহানগরীর রাজ পথে
আলোর জোয়ার
ওর কাছে ভাঁটা হয়ে নেমে আসে নীচে!
জীবনে জোয়ার ওর
নির্যাতন—দৈন্য—অত্যাচার!
ওর বর্ত্তমানে ওর বর্ত্তমান নেই—
মনে শুধু ভাবনা জাগে—
সুদূর অতীত আর দূর ভবিষ্যৎ!

প্রকৃতির আক্রমণে
প্রকৃতির অস্ত্র হানে
দুর্বল কম্পিত দুই হাতে।—
প্রচণ্ড শীতের হাত হ'তে
নিজেকে বাঁচাতে জ্বালে প্রচণ্ড আগুন।
আর বসে বসে ভাবে
অতীতের কথা—
"এম্‌নি আগুন কবে জ্ব'লেছিল ঘরে,
জ্বলেছিল অন্তরে অন্তরে,
প্রান্তরে প্রান্তরে আর দিক হ'তে কোন দিগন্তরে!
সে আগুন নিভে গ্যাছে
অগুন্তি দেহান্তরে
রক্তের বন্যায়!
এম্‌নি আগুন
আরো বহুদিন আগে কবে
জ্বলেছিল আরো—
জ্বলেছিল রক্ত-চোষাদের
দেহ হ'তে রক্ত শুষে নিতে!
সে-রক্ত-চোষার দল ধুরন্ধর স্বার্থান্বেষী
বন্দরে বন্দরে আজও করে ঘোরা-ফেরা
জয়ডংকা সগর্বে বাজিয়ে!
কুটিল চাহনি চোখে, ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের হাসি মুখে!
তাই,
আত্মরক্ষা করে সেই স্বার্থরক্ষীদল—
ছদ্মবেশে ইন্ধন যোগায়
তাদের বিদ্রোহী দেহে—অন্তরে অন্তরে!
ধর্ম ও জাতির নামে
বজ্জাতির মাত্রা ওঠে বেড়ে—
পুড়ে মরে তা'রা,
যা'রা বহুদিন আগে জেলেছিল প্রচণ্ড আগুন,
গৃহহারা হ'য়ে কেউ আমারি মতন
রাস্তায় আশ্রয় নেয়!"

আজ
স্বাধীন হ'য়েছে দেশ।
চমৎকার স্বাধীনতা—
চমৎকার জীবন ওই দাঙ্গাহতা মেয়েটীর!
আগে ভাবতাম—
আমার জীবন দুঃখময়!
ওকে দেখে মনে হোলো—
ওর কাছে আমি আজি হয়েছি স্বাধান।
তাই
আমার যেটুকু স্বাধীনতা,
তাই থেকে
কিছু ভাগ দেবো ব'লে
দাঙ্গাহতা ওই তরুণীকে
আমারই ঘরেতে এনে
দিলাম আশ্রয়—
তা'র কাছে পেলাম আশ্রয়!
চিরকাল তা'কে দেখ্‌বার
সুযোগ আমায় দিল সেদিনের দেখা
প্রচণ্ড শীতের এক রাতে।

ছাত্র সমাজে খেলাধূলার গতি

উমাদাস মৈত্র—তৃতীয় বর্ষ, কলা

দিনের পর দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছাত্ররা খেলাধূলা ও স্বাস্থ্য চর্চ্চা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে দাঁড়াচ্ছে। ফলে তা'রা ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়ছে এবং তাদের energy'ও কমে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এই রকম ভাবে যদি আরও কিছুদিন চলে তবে হয়ত একদিন আমাদের জাতির কাঠোমোই ভেঙ্গে পড়বে! আশা করি এটা কা'রো অভিপ্রেত নয়!

ছাত্ররা বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় এসে পড়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে তা'রা শুধু সমালোচনাই করে—আসরে নাম্‌তে সাহস পায় না! ছাত্রদের মধ্যে এমন একটি ধারণা প্রবেশ করেছে যে তাদের প্রায়ই বল্‌তে শোনা যায়—অমুক খেলা?—ওটা যা'রা খেল্‌তে পারে তাদেরই জন্য আমাদের জন্য নয় (অবশ্য যা'রা অলস এবং গ্রন্থকীট)। আবার কেউ কেউ বলে—ব্যায়াম?—আরে ভাই, পেটে নেই ভাত ব্যায়াম করে মর্‌বো নাকি! কলেজের উঁচু ক্লাসে যা'রা পড়ে তা'দের অনেকেই মাঝে মাঝে বলে—ওসব পোষায় না এ বয়সে! অর্থাৎ তা'দের ধারণা হয়ে গেছে যে তারা বুড়ো হয়ে গেছে সুতরাং খেলাধূলা-ব্যায়াম এসব আজ তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়। এসবের কারণ কি?

অর্থাভাব বা থাল্লাভাবই এর একমাত্র কারণ নয়। পরাধীন ভারতে বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। গোটাকতক শারীরিক প্রতিষ্ঠানও জাতীয় ভাবধারায় গড়ে উঠেছিল। বিদেশী সরকার শারীরিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দেয়। ফলে উৎসাহ নষ্ট না হলেও বাস্তব কর্ম্মধারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিলাতী শাসন কর্ত্তারা নানাভাবে আমাদের জাতীয়তাবোধ নষ্ট করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও তার বীজ তারা রোপণ করে ছিল—বিলাতী খেলাগুলো এদেশে ছড়িয়ে। আমাদের দেশের লোকেরা তখন (এমন কি এখন পর্য্যন্তও) এ খেলাগুলো বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে দেশের যুবকেরা জাতীয় এবং বিজাতীয় খেলার দ্বন্দ্বে পড়ে ক্রমশঃ সরে এসেছে খেলার মাঠ থেকে বৈঠকখানায়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার করতে লাগ্‌লো। স্কুল কলেজের প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে মেতে উঠেছিল আন্দোলনের স্বাদ পেয়ে। তারা চর্চ্চা করতে লাগ্‌লো "পলিটিক্স"। অন্যান্য প্রগতিশীল স্বাধীন দেশের ছাত্রদের মতের সঙ্গে সায় দিয়ে তা'রাও "দেশের ও জাতির মেরুদণ্ড" বলে নিজেদের বিশ্বাস করতে লাগ্‌লো। ধীরে ধীরে তারা বাস্তব ছেড়ে গগনবিহারী এবং উচ্ছ্বাস প্রবণ হয়ে উঠলো। রাজনৈতিক চেতনাবোধ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশেই জেগেছিল একটু বেশী। তাই সেই চেতনার ফল হিসাবে রাস্তায়-রাস্তায়, গলিতে-গলিতে গড়ে উঠেছিল (অথবা উঠেছে) বহু ছাত্র সংগঠন! ক্রমে ছাত্ররা মেতে উঠলো অপ্রয়োজনীয় রাজনীতি নিয়ে এবং ভুলে গেল তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যচর্চ্চা ও খেলাধূলা!

ছাত্র সংগঠনগুলো পরাধীন ভারতে ছাত্রদের চালাতো সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে। সে প্রয়োজন হয়ত আজ তা'দের নেই! তথাপি তাদের কার্য্যক্রমের কোন পরিবর্ত্তন এখন পর্য্যন্তও দেখা যাচ্ছে না। ছাত্রদের এখন সব চেয়ে প্রয়োজন স্বাস্থ্যের—বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক এ বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। ছাত্র সংগঠনগুলোর উচিৎ রাজনীতি (অবশ্য বর্ত্তমানে দলগত রাজনীতিই চল্‌ছে) ছেড়ে স্বাস্থ্যের দিকে এবং খেলাধূলার (বিশেষ করে জাতীয়) দিকে নজর দেওয়া।

[উনিশ]

বাংলার ছাত্ররা নিজেদের গাফিলতির জন্য অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদের তুলনায় বহু অংশে পেছিয়ে পড়েছে বুঝেও, তারা অবুঝের মতই তাকিয়ে রয়েছে। তা'রা practicalএর তুলনায় exhibitionই বেশী পছন্দ করে। তাই তা'রা হয়ত বা খেলার মাঠে ভীড় করে কিন্তু কেউ খেলে না (দু' একজন বাদে)। যদি বা তা'রা বিষ্ণু ঘোষ—বিজয় মল্লিক—যোড়শী গাঙ্গুলীর ব্যায়াম প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে, তবু তা'রা কেউই ব্যায়াম করে না (দু' একজন বাদে)!

ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্কুল-কলেজেরও দায়িত্ব অনেক। স্কুল-কলেজ খেলাধুলার ফী বাবদ অনেক টাকা সংগ্রহ করে কিন্তু ব্যাপকভাবে ছাত্র সমাজ যাতে উপকৃত হয় সে রকম কোন খেলাধুলার বন্দোবস্ত তাদের নেই। ছাত্রের স্বাস্থ্যই যদি না থাকলো তবে সে পড়বে কিসের জোরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বও কম নয়। ছাত্রদের জন্য compulsory physical trainingএর বন্দোবস্ত তাঁদের করা উচিৎ। এবং নূতন যে সব স্কুল কলেজকে তা'রা affiliation দেবেন সেই সব স্কুল-কলেজের খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত মাঠ আছে কিনা তা' দেখে নেওয়া উচিৎ।

অপরাধী বৈজ্ঞানিক

হরিপদ দাস—চতুর্থ বর্ষ, বাণিজ্য

কর্ণেল বোসের পরিচালনায় যে প্লেটুনটা চীনা বৈজ্ঞানিক ডাঃ ইচাংএর হেড কোয়ার্টারে হানা দিতে গেয়েছিল সেটা কেমন করে যে অধ্যাপক ইচাংএর হাতেই শেষটা সদলে বন্দী হয়ে গেল সে সংবাদটী এখনো পৃথিবীর যবনিকার অন্তরালেই রয়ে গেছে!

League of Nations থেকে অধ্যাপক ইচাংকে পৃথিবীর বৃহত্তম শত্রু আখ্যা দেবার পর তাকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে বিরাট অর্থের অংক নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে, রঙ্গমঞ্চের পর্দ্দায় ও পোষ্টার প্লাকার্ডে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, তার প্রলোভনে আমেরিকা ইউরোপ থেকে এর পূর্বেও সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক ও সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত তিনটি দুর্দ্ধর্ষ ইউনিট বিভিন্নভাবে ডাঃ ইচাংকে গ্রেপ্তারের ব্যর্থ প্রয়াস পায়!

* * *

নিরস্ত্র কর্ণেল বোসের পার্টির সকলেই তখন ডাঃ ইচাং এর বন্দীশিবিরে শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট! সময় নির্দ্দেশক যন্ত্রের সংকেতক্রমে আলখাল্লাপরিহিত, চোখে কালো গগল্‌স আঁটা, দীর্ঘবাহু বলিষ্ঠদেহ অধ্যাপক ইচাং Collupsible Gateএর বিপরীত দিকে এসে দাড়ালেন, অধ্যাপক প্রবেশ করার সাথে সাথেই কর্ণেল বোস লক্ষ্য করলেন অশরীরী আধিভৌতিক একটা স্তব্ধতা যেন সমগ্র ঘরটায় সকলের মুখের অন্তেজের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

এ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কেবলমাত্র দুঃসাহসী মহাকালের ঘড়ির কাটার "টিক্ টিক্" এর মধ্য দিয়ে প্রহর গোণা মৃদুশব্দ শোনা যেতে লাগল।

"কি বিস্ময়!" অধ্যাপক ইচাং বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বাংলায় অস্বাভাবিক সংযত কণ্ঠে আরম্ভ করলেন।

"মূর্খ অর্বাচীনের দল! আমাকে বন্দী করবার

দুঃসাহস নিয়ে এসেছ তোমরা! International Court of Justiceএর বিরাট অর্থের অংক, হেরল্ডের "Culprit of Humanity, রয়টারের ভয়াবহ সংবাদ যে প্রতিভাকে কেন্দ্র করে, আমি আশ্চর্য্য! সেই শক্তির সাথে লড়তে এসেছ তোমরা! মৃত্যুর চরম শাস্তি আমি দেবনা। দুঃসাহসী আগন্তুক, তোমাদের আমি আমার শক্তির আর একটি দৃশ্য দেখাবমাত্র।"

অধ্যাপক গীতার মত ছোট একখানা বই ড্রয়ার খুলে বের করলেন।

"চেয়ে দেখো কত সূক্ষ্ম এর আয়তন। চীন, তিব্বত, ভারতবর্ষের অবলুপ্ত বিভূতি শক্তির সার সংগ্রহ। আমার আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত বিভূতি বিদ্যার অষ্টাদশ প্রক্রিয়া মানুষের দেহে মনে রাষ্ট্রে এমন কি সমগ্র পৃথিবীতে তার প্রয়োগ আর তার পরিশিষ্ট সব এই গ্রন্থে সুসংবদ্ধভাবে লিখা।

বিভূতিশক্তির যুগ আসবে পৃথিবীতে অন্যূন আরো সহস্র বৎসর পরে। তোমাদের পৃথিবীতে এখন শুধু আনবিক যুগের প্রারম্ভ, হিংস্র পশুত্ব মানুষের রক্তে এখনো প্রবহমান, কালের আবর্তনে আনবিক যুগে সে পশুত্বের পরিমাণ যখন এক তৃতীয়াংশ হ্রাস হয়ে আসবে তখন পৃথিবীতে আসবে যে যুগ, সে যুগের সংজ্ঞা রশ্মিযুগ। মানুষের অচেতন ও অবচেতন মনে সে যুগ আনবে শান্তিতে বসবাসের প্রাথমিক উন্মুখতা। বিজ্ঞান তখন মানুষের গ্রহান্তর পরিক্রমণের উদ্‌যোগে ব্যস্ত। সে যুগের উত্তীর্ণ মানুষের রক্তে বীভৎস পশুত্ব যখন এক চতুর্থাংশেরও নিম্নে নেমে আসবে তখনই শুধু বিভূতিযুগের প্রারম্ভ। যাক এসব! আমার প্রচণ্ড শক্তির একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষা এখন দেখাবো তোমাদের।"

অধ্যাপক ইনজেকসন টিউবের মত ছোট একটি টিউব হাতে তুলে নিলেন।

"সম্মুখে Radio Transmitterএর মতো যে যন্ত্র দেখছো এরি এই Bottom এ টিউবটা ভেঙে দোঁয়ার মত অদৃশ্য বা ছাড়াবো তা ইথর তরঙ্গের ভিতর দিয়ে গিয়ে রেডিও waveএর মতোই হেভিসাইড ফিয়ারে প্রতিহত হয়ে তোমাদের সেই বিখ্যাত হেরল্ডের সম্পাদককে একমাসের জন্য হিপ্‌নোটাইজ করে দেবে। আমার ইচ্ছার পরিধির বাইরে তার নিজস্ব সত্তা সে সম্পূর্ণ হারাবে। এই যে আমার ডানদিকে Key board, এ সেই অদৃশ্য সম্মোহিনী শক্তি সমুদ্রে পাহাড়ে পর্বতে পরিচালনা করবার নিয়ন্ত্রন যন্ত্র। ভয়ঙ্কর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম ইঞ্চির সহস্রাংশ পর্য্যন্ত এর গণনা, নির্ভুল। সেই প্রচণ্ড শক্তি তোমাদের সম্পাদকের চক্ষুকে প্রথমে আক্রমণ করবে। বিজয়ী হতে না পারলে ললাটের মধ্যভাগ স্পর্শ করবে। তাতেও পরাজিত হলে সমগ্র দেহে বিষাক্ত পোকার মত অদৃশ্যভাবে ছেয়ে ফেলবে। দেহের প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে তার Action আরম্ভ হবে।

এতেও পরাস্ত হলে আমাকে ধরে নিতে হবে তার ইচ্ছাশক্তি। আমার "C" class tubeএর কর্ম্মদক্ষতার চেয়ে বৃহত্তর "B" class tube পরিচালনা করতে হবে। সাধারণ বহুক্ষেত্রে আমার "C" class tubeএই কাজ শেষ হয়ে যায়। ছোট খাট একটা গ্রামকে আক্রমণ করতে "B" class tubeএর প্রয়োজন। আর এই যে হেডফোনের মত যন্ত্রটি দেখছ এদিয়ে আমি দূর লক্ষ্যবস্তুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকি। থার্মোফ্লাস্কের মত এই বোতলে যুদ্ধমৃত প্রায় লক্ষাধিক সৈনিকের বিপুল ইচ্ছাশক্তি লুকায়িত আছে। সেলিভিসন-এর মতো এই যন্ত্রের মধ্যে বর্ত্তমান যুগের হিংস্র গরিলা, পাইথন, অক্টোপাশ থেকে আরম্ভ করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপ, টারাডেকটাইল, ডাই-নোসেরাস প্রভৃতি অজস্র মৃত প্রাণীর ইচ্ছাশক্তি বন্দী করে রাখা হয়েছে। তোমরা বুঝবে না প্রাণীর দৈহিক মৃত্যুর অবশেষেও কি উপায়ে ইচ্ছাশক্তি বেঁচে থাকতে পারে। অশরীরী আধিভৌতিক সত্তা পুঞ্জীভূত এই ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা প্রকাশনীয় পরিভাষার, তোমাদের অভিধানের অতীত। অসাধারণ এদের কর্মক্ষমতা। বিজ্ঞান বিভূতি যোগ-সাধনার সমন্বয়ে এ যন্ত্রের নির্মাণ, বিশেষ অতীত,

বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের বিরাট সত্যের উপর ভিত্তি করে এ যন্ত্রের উদ্ভাবন, কত প্রকাণ্ড এর শক্তি তোমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তার অণুমাত্র চিন্তা করতে গেলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে।

সংকীর্ণ সময়ে আমার সমগ্র শক্তির পরিচয় দেখাবার পথ রুদ্ধ। আর কয়েকটি কথার পর আমি তোমাদের মুক্তি দেব। এ সত্য পৃথিবীর কোন পত্রিকা প্রকাশ করেনি এবং করবেও না। তোমরা ভারতীয়। ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত U.N.O.তে আমার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেনি, সে আমি জানি। এ সত্য শুধু তোমাদেরই আমি জানাবো।

"আমার পূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত।" অধ্যাপক যেন লৌহ-মানব হয়ে উঠলেন, যেন কোন এক দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকার আবরণ এখনি ছিন্ন করবেন। "তখন লণ্ডনের National Research Institute এ আমার জীবনের প্রারম্ভ। ১৯২৬ সালে আণবিক শক্তির এক প্রাথমিক তথ্য আমি আবিষ্কার করি। কিন্তু সেই তথ্য চুরী করেছিল কে জানো? তোমাদের সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ইতালির বৈজ্ঞানিক। সমগ্র ইউরোপ তাকে কি বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছে তা তোমরা পত্রিকায় দেখেছ, আমার ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ সেদিন কোন পত্রিকার ক্ষুদ্র অংশেও স্থান পায়নি। পেয়েছিলাম শুধু ঘৃণা অনাদর। তারপর নতুন অভীষ্টের সন্ধানে দুর্গম গিরিবর্তে নিঃসম্বল যাত্রা। বিভূতিশক্তির পুনরুদ্ধারে তারাইনের জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড তিব্বত, লাসায় পরিভ্রমণ! সেসব ইতিহাস তোমাদের বলা নিষ্প্রয়োজন।

আর আজ.....আমি আমার পূর্ণশক্তি নিয়ে জ্যান্ত বিভীষিকার মতো সমগ্র ইউরোপকে ধ্বংসের প্রেতকুণ্ড করে ফেলতে পারি। আমার অপরিমেয় শক্তি সন্ধান তোমাদের আজকের সংকীর্ণ পৃথিবী কতটুকু জ্ঞাত! মিডিয়াম, প্লাঞ্চেট, আন্টাপ্লাজম এই নিয়েই তো তোমাদের পৃথিবীর বিভূতি বিদ্যার জ্ঞান, সে যাক্, আর এক কথা স্মরণ রেখো.....

"পাশ্চাত্যের অর্থগৃধ্নুতা, শ্রেষ্ঠত্বের ব্যর্থ অহমিকা, উদ্ধত রাষ্ট্রনায়কবৃন্দের প্রগল্‌ভতা, সমস্ত ধ্বংস করে এক শান্তির পৃথিবী সৃষ্টির স্বপ্নই আমার জীবনের অভিলক্ষ্য!

অনাদৃতা

শৈলেন দাস—প্রথম বার্ষিক শ্রেণী (বাণিজ্য বিভাগ)

একটি আলোর বিন্দু
দোলে আঙিনায়।
চাপা আঁধারের বুকে
সেও বুঝি মরে দুখে
ক্ষীণ কণ্ঠে শুষ্ক পিয়াসায়।
একটি আলোর বিন্দু দোলে আঙিনায়।

একটি লতার ফুল
গন্ধ ছড়ায়
বিকশিত অন্তরে।
দিগন্তে, প্রান্তরে,
আজিও বাঁচিয়া আছে
ম্লান সুষমায়।
এসেছিল ধরনীতে
একদিন না চাহিতে
ভুলের ভেলায় বুঝি
সেও ভেসে যায়—
একটি লতার ফুল গন্ধ ছড়ায়।

কবে কোন মধু মাসে
একখানা গান,
প্রেমের বকুল তলে,
গেয়েছিল পলে পলে,
বিরহিনী প্রিয়া কোনো
ব্যর্থ অভিমানে।

শ্যামল সৈকত ধরি
সে সুরের অনুসরি,
আসিয়াছি দীর্ঘ অভিযানে।

সহসা হারায়ে পথে,
নদী, মরু, পর্ব্বতে,
স্মৃতিরে মথিয়া ফিরি
ব্যাধাহত প্রাণে।
কবে কোন মধু মাসে
একখানা গানে।

স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ

নকুলেশ্বর রাহা রায়—প্রথম বর্ষ, সাহিত্য

কথাটা শোনা অবধি কেমন যেন হ'য়ে গেছেন তিনি। রাতে ঘুম হয় না। বিনিদ্র চোখে চেয়ে থাকেন সূচীভেদ্য অন্ধকারের দিকে। ফিস্ ফিস্ করে কারা যেন কথা বলে। বাতাসে কেমন একটা অব্যক্ত ব্যাথার অস্পষ্ট গুঞ্জন। কারণে অকারণে চোখ ফেটে জল বেরোতে থাকে। চারিদিকে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। মুখ ফুটে কারো কাছেই বলতে পারেন না মনের কথা। মনে মনে গুমরে মরেন।

সুধীর সবই বোঝে, কিন্তু সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না। কিই বা আছে বলবার। তবু সান্ত্বনার সুরে বলে, "মিছে দুঃখ করে লাভ নেই মা। যেতে যখন হবেই। এখন না গেলে পরে আর যাবার কোন রাস্তাই থাকবেনা।"

মা কোন জবাব দিলেন না। সেই ন' বছর বয়সে এ বাড়ীতে বধূ হয়ে এসেছিলেন। তারপর কত সুখে দুঃখে চল্লিশটা বছর কেটে গেছে। এই মাটির সঙ্গে কত

সুখ দুঃখের কাহিনী জড়িত। একে ত্যাগ করে যাওয়া যে কত বড় কষ্টের তা' আর কেউ বুঝবে না। উদ্গত অশ্রু বহু কষ্টে সংবরণ করেন।

—"দাদা যত শিগ্‌গির যাবার ব্যবস্থা কর বাপু"—হাঁপাতে হাঁপাতে মীনা এসে উপস্থিত হয়। নিশ্বাসের সাথে সাথে তার সর্ব্ব শরীরও দুলতে থাকে। চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। দেখলেই বোঝা যায় কি যেন এক দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে।

—কেন রে, কি হ'লো?

সে বলে ঘটনা। পাশের বাড়ীর সতীশ বাবুর মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে এক চিঠি পাঠিয়েছে। তাদের কথায় সম্মত না হ'লে জোর করে নিয়ে যাবে তারা। আজই সতীশ বাবুরা চলে যাবেন এখান থেকে, উপসংহার করে মীনা।

এ আর নতুন কি! নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিয়ে করতে চেয়েছে, সময়ও দিয়েছে! এখনো যে নিয়ে যায়নি এইত আশ্চর্য্য! ছেলে তাকায় মায়ের দিকে।

—সেই ভালো বাবা তুমি মীনাকে নিয়ে কলকাতা যাও। আমি বুড়ো মানুষ, আমার ভয় কি?

—সে হয় না মা, এরা সবই করতে পারে। তাছাড়া গ্রাম প্রায় জনশূন্য। এতে একলা থাকতে পারে নাকি কেউ। ওরা যে আগুন লাগিয়ে দেবে ঘরে, ধান কেটে নেবে জমি থেকে।

কথাগুলি হয়ত অতিশয়োক্তি কিন্তু মিথ্যে নয়। মা তাকান বাইরের দিকে। রান্নাঘরের চালে নিজের হাতে রোপন করা লাউ গাছে ধরেছে লাউ, ঝাকায় থোকা থোকা ছিম। আর সামনেই গাঁদা ফুল, গাছ ভরা লাল হলদে রঙ বেরঙের ফুল। বাতাসের তালে তালে এ ওর গায়ে পড়ে হাসাহাসি করছে। মা কোন মতে বলেন, বেশ তবে চল। তাঁর সর্ব্বশরীর কেঁপে ওঠে, ভেঙ্গে হয়ত চুরমার হয়ে যাবে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে তিনি উঠে যান সেখান থেকে।

কলকাতা তারা এসেছে। যান্ত্রিক সভ্যতা বিমুক্ত পাড়াগাঁয়ে তারা মানুষ। তাই সহরের চাকচিক্য, গাড়ী ঘোড়া, আকাশচুম্বী বাড়ী ঘর দেখে অভিভূত হয়ে যায়। মীনা নানা অসংলগ্ন প্রশ্নে জর্জ্জরিত করে তোলে সুধীরকে।

—আচ্ছা দাদা ওটা কি গাড়ী? —ও মা ঐ দেখ কত বড় একটা মেয়ে মাত্র ফ্রক পরে হেটে চলছে—পুলিশটা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন, ওর দেখছি চাপা পড়ার একটুও ভয় নেই? একি, ও হাত তুলতেই গাড়ীটা থেমে গেল কেন?

তার সেই অসংলগ্ন কথার সঙ্গে তাল রেখে গাড়টাও অসংলগ্ন প্রলাপ বকতে বকতে ছুটতে লাগলো ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কংক্রিট করা রাস্তার উপর দিয়ে। মা কিন্তু নীরব। ভাষা যেন মূক হয়ে গেছে তাঁর। এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন অসীম আকাশের পানে। এই অপরিচিত দেশে অপরিত পরিবেশ থেকে চির পরিচিত নীল আকাশ খানাই তাঁকে মুগ্ধ করেছে বেশী।

বিকট এক চীৎকার করে গাড়ীটা থেমে যায় একটা বস্তীর সাম্‌নে। টাল সামলাতে না পেরে মীনা চলে পড়ে দাদার কোলে। সুধীর প্রথমে নেমে যায়।

—এখানে কেন?—মীনার চোখের সামনে জল জল করে ভাসছে তখনো সেই সমস্ত বড় বড় সুসজ্জিত বাড়ী, যারা সারা পথ তাদের গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা ছুটছিল।

—এখানে কিন্তু থাকতে পারবোনা দাদা। উঃ কি নোংরা, আর কি বিশ্রী গন্ধ। এর মধ্যে মানুষ থাকতে পারে?

পাগল। এটা তাদের সেই গ্রাম নয়। স্বাধীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর কলকাতা। তারা তবুও যা মাথা গুঁজবার একটু স্থান পেয়েছে। কত লোক যে ঘরের অভাবে রাস্তায় টো টো করে বেড়াচ্ছে।

—আচ্ছা দাদা সামনে ঐ যে বাগানওয়ালা বাড়ীটা ওতে একখানা ঘরও পেলে না?

—ওখানে একখানা কেন ভাই, আমাদের মত পঞ্চাশ ঘর লোকের থাকার যায়গা আছে। কিন্তু ও বাড়ী আমাদের থাকার জন্য তৈরী হয়নি।

(BOARD OF EDITORS)
1948

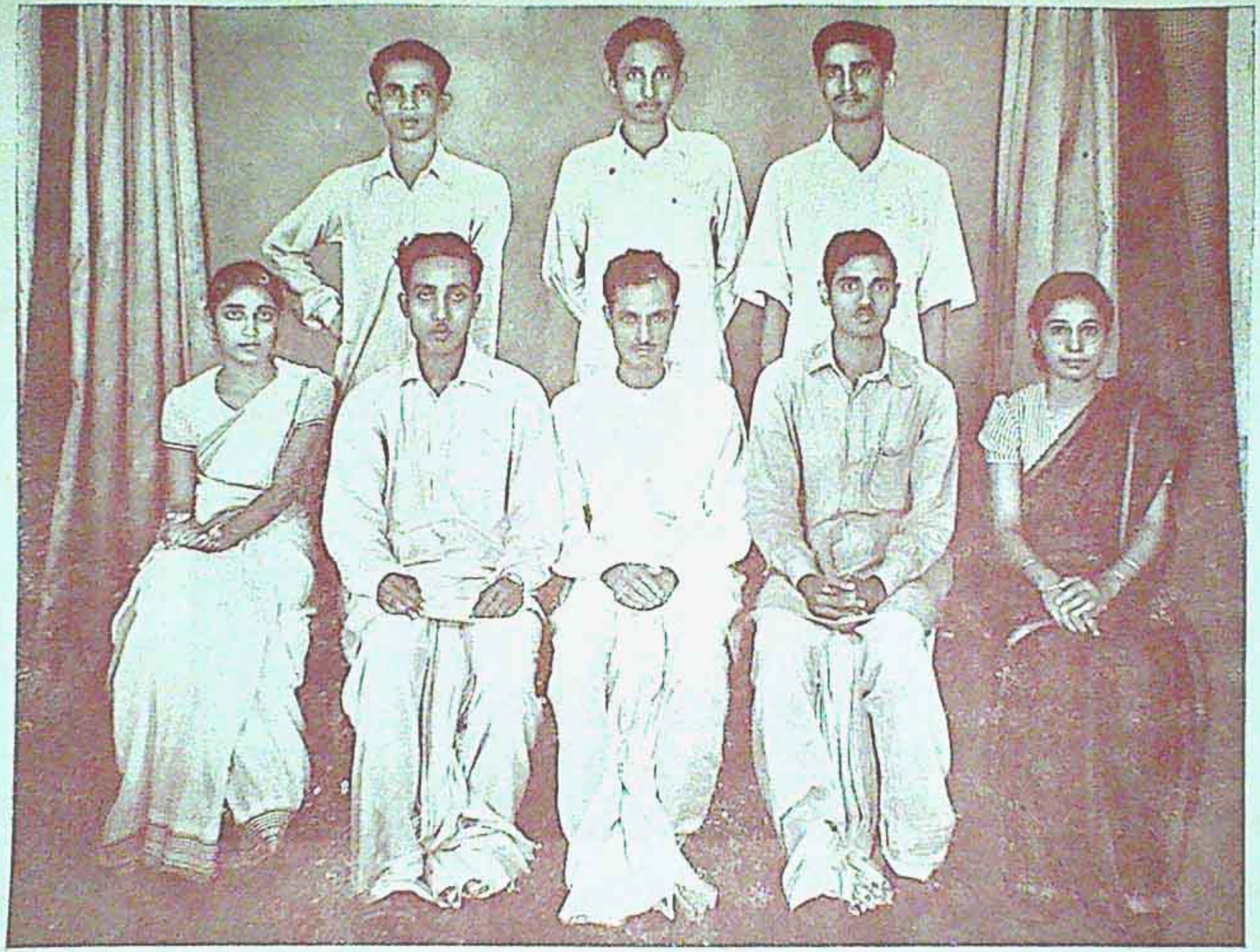

On Chair (from left)—Bithi Sen, Tejen Guha Roy *(Editor-in-Chief)*, Prof. Katyayanidas Bhattacharyya *(Prof.-in-Charge—Asutosh College Patrika)*, Sunil Das Gupta, Nilima Bose.

—আমারা তো আর বিনে পয়সায় থাকব না?

—টাকাতেই সব হয়নারে। ওখানে থাকতে হলে ভগবানের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসতে হয়।

এ আবার কেমন কথা। বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকে দাদার দিকে। সুধীর দেখে মায়ের মুখে কোন পরিবর্ত্তনের চিহ্ন নেই। চল্লিশ বৎসরের ভিটা যদি তিনি ছেড়ে আসতে পারেন, তবে এ অসুবিধাটুকু সইতে পারবেন না কেন। এযে সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। মীনা কেবল থেকে থেকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে বাগানওয়ালা বাড়ীটার দিকে।

ছোট্ট একটা খোলার বাড়ী। পিছন দিয়ে তার একটা নর্দ্দমা, ছোট খাট একটা খাল বিশেষ। এর দৌলতে পেটে ক্ষিদে থাকলেও, খাবার নামে পেট ভুড় ভুড় করতে থাকে। আশে পাশের বড় বাড়ী ও দু'একটা গাছ সূর্য আর পবন দেবের এ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছে। এরই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে সুধীর। যেমন অন্ধকার তেমনি স্যাঁৎসেতে। মাসিক ভাড়া ২০৲ টাকা, তার সাথে কিছু সেলামী। স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ! মে গড্ ব্লেস দি বাড়ীওয়ালা! কিন্তু সব কিছুই ম্লান হয়ে গেছে জলের কাছে। বাড়ীর মধ্যে কল নেই। সারা বস্তির চাহিদা মিটাবার জন্য একটা মাত্র কল দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। ভগবান করুণাময়, অন্য কল থেকে এটায় একটু মোটা নালেই জল পড়ে।

—"আমি আর বাইরে থেকে জল টানতে পারবোনা", কলসীটা কাঁখ থেকে নামাতে নামাতে মীনা বলে। মুখখানা যেন রক্তিম, কণ্ঠ একটু কম্পিত।

সত্যি মীনাকে দিয়ে জল আনান ভাল হয়নি। সে চৌদ্দ থেকে পনেরয় পা দিয়েছে। বয়সটা যেমন গৌরবের তেমনি বিপদের।

—'তোর আর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি', বালতি নিয়ে মা যান জল আনতে। মনে পড়ে সেই 'ছায়া ঘেরা শান্তির নীড়' ছোট গ্রামখানি। অতীতকে কি কোন রকমেই ভোলা যায় না!

মীনা ততক্ষণে অপটু হস্তে ঘুটে জ্বালিয়ে আঁচ দিচ্ছে। মন কিন্তু কল্পনা রথে চড়ে গেছে ঐ সামনের বড় বাড়ীর অন্দর মহলে।

সুধীর রেশন নিয়ে ফিরে এসেছে। পা যেন আর চলতে চায় না। কেমন করে সে বলবে আতপ চাল নেই। পাওয়া যায়নি। মা তার আজ দু'দিন যাবত উপোস। ধপ করে বসে পড়ে বারান্দায়। নিমীলিত চোখের প্রান্তে চিক্ চিক্ করে কি—জল? সে হয়ত জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে স্বাধীন ভারতের রূপ।

ঐ সুদূরের গাঁয়

ধীরেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার—প্রথম বর্ষ বিজ্ঞান

কে কে যাবি আয়রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয়,
আকাশ যেথা মিশেছে ঐ দূর সে নীলিমায়।
দূর বলাকা যাহার পানে,
সাড় দিয়ে যায় হাওয়ার টানে,
অবুঝ অবোধ মনটা আমার যেথায় যেতে চায়।
কে কে যাবি আয়রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয়।

কে কে যাবি আয়রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয়,
সেথা সবুজ ধানের শীষগুলি সব কাঁপছে মৃদু বায়।
নেইকো যেথায় হিংসা দ্বেষ,
সে যে স্বপ্নে ঘেরা সোনার দেশ,
সেথায় ভায়ের হস্ত ওঠেনা গো অপর ভায়ের গায়,
কে কে যাবি আয়রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় ॥

ধনী গরীব নেইকো যেথায় নেইকো যেথায় আপন পর,
সমাজ যেথা গড়েনি ভাই ছোট বড়র পৃথক স্তর।
সবাই খাটে, যে যা পায়
মিলে মিশে সবাই খায়,
দেশের বিপদ ঘনিয়ে এলে সবাই মিলে এগিয়ে যায়,
ঐযে অমন সোনার দেশে কে কে যাবি আয়রে আয়।

বিশ্বকবির শেষ বাণী

কালীসাধন মুখোপাধ্যায়—তৃতীয় বর্ষ কলা

প্রান্তিক রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনার শেষ প্রান্তে যুগান্তের সন্ধিকালের এক নতুন সুরের আগমনী দিয়ে গেছে। প্রান্তিকোত্তর রবীন্দ্রনাথ—বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ; ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর রাজনৈতিক আকাশ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে এল। যে নতুন স্বাধীনতার আশা, নতুন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন কর্ম্মচঞ্চল ইউরোপের প্রাণে একটা নবযুগের সঙ্কেত এনে দিতেছিল—অকস্মাৎ তাদের আশা চূর্ণ করে ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল নারকীয় ক্ষুধা নিয়ে। তাদের পিছনে ছিল গণতন্ত্রভীত কুচক্রী ধনতন্ত্রীদের সক্রিয় সমর্থন—দ্রুত তালে তারা ক্ষমতা লাভ করল। ১৯৩৬ সালে ইটালী অতর্কিতে আক্রমণ করে গ্রাস করল অসহায় আবিসিনিয়াকে—জাপান ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তি-সংগ্রামী চীনের বুকে। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক মুক্তির আদর্শ ধুলায় লুটিয়ে পড়ল, চূড়ান্ত নিম্নস্তরে নেমে এল নীতি ও মানবতার আদর্শ ধোপদুরস্ত পোষাক ত্যাগ করে।

এদিকে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর প্রতিক্রিয়ার সময় পার হওয়ার কালে এক নতুন ভাবধারা ও আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল এবং তাকে পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ প্রগতিবাদী নেতৃবৃন্দ রূপ দিলেন এক বলিষ্ঠ নতুন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে। তখন নেমে এল সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ যন্ত্র—অত্যাচারে অবিচারে কণ্ঠরুদ্ধ করে দিতে লাগল নব সংগ্রামের সম্ভাবনার। যে প্রিয়তম মানুষের জয়গান কবি ক'রে এসেছেন তার চরণ শৃঙ্খল কঠিনতর হয়ে গেল এবং সর্ব্বশেষে ১৯৩৯এ মানবতার ভবিষ্যৎ লুটিয়ে পড়ল ধ্বংস ও মৃত্যু রথচক্রের তলায়।

ঠিক এমনি সময়ে কবির প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল অগ্রসরমান পদধ্বনি। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্য্যন্ত একদিকে মৃত্যুর সাথে ও অপরদিকে পঙ্কিল দানবীয় সভ্যতার সাথে চলল তার অবিশ্রাম সংগ্রাম। প্রান্তিকোত্তর কাব্যধারা এই সংগ্রামের অভিব্যক্তি। কবি বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যু তার কুটিল পদক্ষেপে একমাত্র তাঁর জীবনেই আসছেনা, মৃত্যু তার সমস্ত মারণাস্ত্র ও দলবল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে জটিল স্বার্থান্ধ সভ্যতার অন্তিম শয্যার দিকে। অথচ এই সভ্যতাও সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকেই মানবতা একদিন জয়ী হবে—মুক্তির দিগন্তনীল অঙ্গনে দাঁড়িয়ে করবে জীবনের জয়গান—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। যত কিছু তাঁর মহৎ ও পূর্ণ মানবতার আদর্শ তিনি গাঢ় করে তুলেছিলেন সারা জীবনের সাধনা দিয়ে। জীবন সায়াহ্নে তিনি দেখলেন—সব ভেঙ্গে চুরে ধুলায়

লুটিয়ে গেল। ১৯৩৮ সালে হিজলীর বন্দীদের ওপর পাশবিক গুলিচালনায় তার স্তব্ধতার বাঁধ ভেঙ্গে গেল—তীব্রকণ্ঠে তার প্রতিবাদ করলেন। ১৯শে পৌষ গান্ধীজীকে কারারুদ্ধ করা হল। বন্ধন নিপীড়িত এই দেশের উপরে এই অমানুষিক নির্মমতায় সভ্যতার প্রতি শেষ বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়ার বেদনা মূর্ত হল সুতীব্র জ্বালায় পরিশেষের 'প্রশ্নে'—

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা—
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে।
তাইত তোমায় সুধাই অশ্রুজলে,
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিবাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো?'

এই প্রশ্নই গভীরতর ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে প্রান্তিকের ছত্রে ছত্রে। প্রান্তিকোত্তর পর্য্যায়ে কবির আজীবন আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠুর আদর্শের সংঘর্ষবোধ নগ্ন, সচেতন ও তীব্র। ফ্যাসিজমের পাশবিক উল্লাস দানবীয় ক্ষুধার প্রচণ্ড হাহাকার যুদ্ধের দুন্দুভি বাজিয়ে বিশ্বজগতের বুকে ত্রাসের কম্পন দিয়ে উঠল। মৃত্যু ও ধ্বংস, নিপীড়িতের ক্রন্দন, অসহায়ের মৃত্যুবরণ কবির ক্ষুব্ধ চিত্তকে দারুণ ভাবে নাড়া দিল। যুদ্ধ দীর্ণ জগতের হাহাকার, ফ্যাসিবাদীদের নৃশংসতা, বোমারু গর্জন ও অসংখ্য হত্যালীলায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সেই চিত্তের চঞ্চলতা প্রকট হয়ে উঠল—

এদিকে দানব পক্ষী শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদী পার হতে,
যন্ত্রপক্ষ হুঙ্কারিয়া নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি
আকাশেরে করিল অশুচি!
মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন—

এখানে তার আবেদন গিয়েছে ভগবানের কাছে,—কিন্তু সংকট চেতনার তীব্রতা চিরন্তন বিশ্বাসের মূল ধার নাড়া দিয়েছে পরবর্তী কবিতায়—তাই তিনি আবেদন জানিয়েছেন মানুষের প্রতি। শুধু ভাবাতিশয্য ও উচ্ছ্বাস নয়—অতীন্দ্রিয় শক্তির শরণ নয়—বাস্তব মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক'রে সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনিত করেছেন। চারিদিকে নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে সত্যশিব সুন্দর শান্তির উপাসক রবীন্দ্রনাথের হৃদয় দীর্ণ করে উঠেছে আর্তনাদে। "শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"। সেই জন্যই বিদায় নেবার আগে ডাক দিয়ে উঠলেন

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

সেঁজুতির জন্মদিন কবিতায় যথার্থ বিদ্রোহীর মত উপহাস করে উঠেছেন মিথ্যাচারী গর্বান্ধ সভ্যতাকে—

শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে ওঠে বাজি
তবু যেন মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে
লজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে।

এই নরম সুর আবার তীক্ষ্ণ ও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে নব জাতকের মধ্যে। নবজাতকের নিরলঙ্কৃত স্পষ্ট ও সবল প্রকাশভঙ্গীতে ব্যক্ত হ'ল নতুনতর উপলব্ধি। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অনুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি নতুন ভাবে আকৃষ্ট হয়ে কবির মন প্রান্তিকের অপার্থিবতা থেকে নবজাতকে যুদ্ধের বীভৎস অস্ত্রধ্বনিত পটভূমিকায় নগ্ন বাস্তব চেতনায় নেমে এসেছে। কবির মন আহত, মনুষ্যত্বের বলির রক্তে রক্তাক্ত। বারে বারে এই বেদনা ক্ষতে হ'য়ে উঠলেও—এই বেদনাকে নৈরাশ্য থেকে এক মহত্তর স্তরের সন্ধান দিয়েছে—মানুষের অন্তর্নিহিত কল্যাণ শক্তির প্রতি একটি অবিচলিত বিশ্বাস। নবজাতক বৈপ্লবিক চেতনা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত করল। তাই কবি নবজাত শিশুকে অভ্যর্থনা করছেন দানবের সাথে সংগ্রামের তরে—

অমর লোকের কি গান এসেছ শুনে
তরুণ বীরের তূণে

কোন মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির' পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম তরে।

এ সংগ্রাম আর theoretical নয়, ভাবপ্রবনতা বা sentimentalism নয়, এক বিরাট বিপ্লব চেতনার বাস্তব রূপ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন—

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন
সভ্যানামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন।

এই ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের মধ্যে সংগ্রামই আগামী বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি! যুগ যুগান্তের সঞ্চিত বঞ্চনা ও নিপীড়নের অভ্রলেহি মিনার চূর্ণ হয়ে যাবে নব জাগ্রত গণদেবতার পদভরে। এই সংগ্রামই শেষ সংগ্রাম। শোষক ও শোষিত, বঞ্চক ও বঞ্চিত, অত্যাচারী ও নিপীড়িতের মধ্যে যে বিরাট শ্রেণী সংগ্রাম ঘনিয়ে উঠেছে —তা' ভীষণ থেকে ভীষণতর হ'য়ে উঠবে—ভূরিভোজীরা ক্ষুধিতদের মরণ কামড় দিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে—

সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য্য শান্তি উঠিবে জেগে,
মিছে করিবনা ভয়।

কিন্তু সেই শান্তি সুলভ নয় তাহার মূল্য দিতে হবে অনেক। ভয়াবহ ধ্বংসের মধ্য দিয়েই হবে তার মঙ্গলময় আবির্ভাব। কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অভিযাত্রীদের ভয় পেলে চলবেনা, প্রস্তুত হতে হবে কুটিলতম প্রতারণার জন্য—

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।

তারপরে একদিন—

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবনে নূতন আলোকে জাগিবে নূতন দেশে।

এ আশা ধর্ম্ম বিশ্বাস নয়—কিম্বা হতাশ আত্ম সান্ত্বনা নয়—এর উৎস বাস্তব জীবনবোধ। মানুষের কল্যাণশক্তির প্রতি তার আবেদন। তাই তিনি বিশ্বাস করেন নবজাত মানব শিশু একদিন—

রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলন তীর্থ শান্তির বাঁধ বেঁধে।

তাই সভ্যতার সংকটের মধ্যেও তাঁর আশা লুপ্ত হয়নি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করে গেছেন। আশা করেছেন—"মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে" তাই অনাগত কালের কবির উদ্দেশ্যে বলে গেছেন,

এসো কবি অখ্যাত জনের,
নির্বাক মনের
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
মুক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে
ওগো শুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

একদিকে গণচেতনার দীপ্ত অভিব্যক্তিময় নব সংগ্রামের আহ্বান ও অপর দিকে অনাবৃত হৃদয়ে মানুষের মহৎ মর্য্যাদাকে অভিনন্দিত ক'রে নেবার আহ্বান তিনি দিয়ে গেছেন ভাবীকালের উদ্দেশ্যে। মানুষ মানুষের মর্য্যাদা আবার ফিরে পাবে। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাক্ত অরুণোদয় আসন্ন! এই তাঁর শেষ বিশ্বাস! কবির সে আহ্বানের কি যোগ্য উত্তর আমরা দিতে পারবো? তাঁর শেষ বাণীকে শেষ আশাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারবো?

এক রাত্রি

506

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম্-এ—প্রাক্তন ছাত্র

রামাপদ বসুর মেয়ে উমাকে আমি ভালবাসতাম। সেই জন্যেই যে সে আমাদের বাড়ী কৎবেল খেতে আসত তা নয়। কৎবেলের উপর উমার ভারি লোভ ছিল। প্রায়ই বিকেলবেলা খোপায় ফুল গুঁজে কপালে পয়সার মত বড় একটা টিপ লাগিয়ে রঙিন একখানা কাপড় পরে আমাদের বাড়ীর কবলে এসে হাঁকত—জেঠাইমা বীরুদা কোথায় গো? জেঠাইমা অমনি বীরু বীরু বলে বার দুই ডাক দিয়ে বলতেন—উমাকে দুটো কৎবেল পেড়ে দিবি না? তারপর আমার সাড়া পেয়ে উমা আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াত। তখন আমি কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়তাম। ঘরের এটা ওটা নেড়ে এখানকার জিনিষ ওখানে নিয়ে গিয়ে হাত-পা ছুড়ে এমন ভাব দেখাতাম যে গাছে উঠে কৎবেল পাড়বার সময়ই নেই। ক্ষণিক ঠায় দাঁড়িয়ে আমার ভাবটা ভাল করে লক্ষ্য করে উমা ঘরে ঢুকে বলত, সামান্য একটা বেলের জন্যে এত চঙ করবার দরকার কি বাপু—ন্যাকাপনা আর করতে হবে না, দেবে তাই চলো। এই বলে আমায় হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাগানে নিয়ে যেত। তারপর দুটো বেল পাড়তে ঘণ্টাখানেক লেগে যেত। বেল দুটো হাতে নিয়ে উমা বলত, সাত-জন্ম মানুষ না খেয়ে মরে সেও ভাল তবু যেন এমন বেল তারা না খায়।

সেদিন বাগানে গিয়ে উমার আঁচল টেনে ধরে বলেছিলাম, উমা তুই যদি আমায় বিয়ে করিস তা হলে আমি ঝুড়ি ঝুড়ি কৎবেল রোজ তোর বাড়ী বয়ে দিয়ে আসব। বিয়ে করবি আমায়? শুধু একবার মুখ দিয়ে বল যে করব।

ধেৎ আমি বলব না। এই বলে উমা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। তখন তাকে নিয়ে ক্ষণিক টানাটানি। 'করব' কথাটা তার মুখ দিয়ে কিছুতেই বার করতে পারি না। সে শেষকালে চোখেমুখে কাপড় গুঁজে মাটিতে বসে পড়ল, মুখটাকে দুই হাটুর ভিতর লুকিয়ে রাখল। তার খোপায় অজস্র ফুল বসানো চাঁপা বেল কৃষ্ণকলি ইত্যাদি এক একটা করে তুলে নিতে লাগলাম। কিন্তু সে কিছুতেই মাথা তুলল না। শেষে তার পায়ে হাত দিয়ে বল্লাম, একটিবার বল উমা।

পায়ে হাত দিতে সে মুখ বার করে চোখ রাঙিয়ে বল্লে, আমার পায়ে হাত দিলে কেন? যদিওবা বলতুম তাও আর বলব না।

হেসে বল্লাম, তোর আর বলতেও হবে না। যেটুকু বলেছিস ওতেই আমার হয়ে গেছে। চল বেলগুলো তোর বাড়ী বয়ে দিয়ে আসি। সে কপট ক্রোধ করে বললে, বীরুদা মার খাবার ভারি ইচ্ছে হ'য়েছি বুঝি? ভাল চাও ত বেলগুলো দাও। এই বলে বেলগুলো কেড়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার মাথার ফুলগুলি আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে বল্লাম, প্রণাম কর। সে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমার নাকের উপর ঠেকিয়ে প্রস্থান করল।

ম্যাট্রিক পাশ করে যখন কলেজে যাই তখন আমাদের বিয়ের কথাটা উঠেছিল। কিন্তু উমার পর্য্যায় ২৭, আমার ২৬, উমা কুলীনের ঘরের প্রথম কন্যা আমি মৌলিক। উমার বাবার অবস্থা ভাল আমার বাবার যৎ-সামান্য জমিজমা। কাজেই শুধু এক 'ভালবাসা' দিয়ে উমাকে পাওয়া গেল না। তারপর কবে উমা তার পিসিমার বাড়ী বেড়াতে গেল এবং তাঁদের সুপারিশে কবে কোন জমিদার, বাড়ী তার বিয়ে হল কোনদিন সে খবর রাখি নি, কৌতূহলও ছিল না।

বাবা মারা গেলেন। টিউসানি করে B.A. পড়া

শুরু করলাম। মরি আর বাঁচি B.A. পাশ করতেই হবে। নইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মান থাকে না। বিদেশীরা মুখ বেঁকিয়ে বলে যায় "ভারত এখনো অশিক্ষিত অসভ্য।" তাই শ্রদ্ধেয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের উপর কতই না আশা রাখেন। নইলে জন-গণ-শিক্ষার জন্য তিনি তাঁর সদর দরজাগুলো এমন করে খুলে রাখবেন কেন? তাঁর কাছে ধনীদরিদ্রের প্রভেদ মাত্র নাই। সকলের জন্য সদা অবারিত দ্বার তাঁর।

আজ ভাবি আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনী-দরিদ্রের যদি একটা প্রভেদ থাকত ত অন্তত আমার মত দরিদ্র হতভাগাগুলো বেঁচে যেত। নিজের জীবন দিয়ে আজ ত বুঝতে পারি যে B. A. পাশ করতে গিয়ে বন্ধুর দোকানে শুয়ে আর কড়ের হোটেলে খেয়ে শরীরের ওজন কমতে কমতে আজ যে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি তাতে গ্রামে ফিরে গিয়ে বাড়ীর বাগান কুপিয়ে কলামূলা তৈরি করে যে নিজের অন্ন সংস্থান করব সে ক্ষমতাও চিরদিনের জন্য লোপ পেয়ে গেছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে ইচ্ছে হয় যে আমার মত হতভাগারা যখন B.A., M.A. পাশ করে বেরোবে তখন তাদের জন্যে একটা একটা পেনসানের ব্যবস্থা করলে ভারি ভাল হত। B.A., M.A. পাশ করতে গিয়ে দেহের বল মনের সাহস ইহকাল পরকাল কিছুই থাকে না, এখন একটা পেনসানের ব্যবস্থা না করলে আমরা বাঁচি কি করে!

যাক, B.A. পাশ করলাম; কিন্তু চাকুরির জন্য চেষ্টা করলাম না। মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেদের জন্য চাকরি যে কোনস্থলেই থাকে না এটা কলেজে পড়বার সময়ই শেখা ছিল। সুতরাং "কাষ্ট্-হিন্দু" হয়ে জন্মগ্রহণ করে আমরা যে মহাপাপ করেছি সারাজীবন টিউসানি করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লেগে গেলাম। সেই সঙ্গে দৈনিকপত্রের 'গৃহ-শিক্ষক-আবশ্যক-এর পৃষ্ঠাটা প্রতিদিন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখে যেতে লাগলাম।

একদিন ভারি আনন্দ হল। দেখলাম লেখা আছে —গৃহশিক্ষক চাই—আহার বাসস্থান ফ্রী—হাত খরচও কিছু কিছু দেওয়া হইবে। সাক্ষাৎ করুন।"

আহারের জন্য বিশেষ ভাবনা ছিল না। খেসারির ডাল এবং কুমড়ার-খোসা—আলু—পুঁইশাকের চচ্চড়ি জগমন উড়ে আমায় ভারি আপ্যায়িত করে খাওয়াত। তবে বাসস্থান বলতে যা বুঝায় তা আমার ছিল না। এক বন্ধু B.A. পাশ করে ডায়িং ক্লিনিং খুলেছিলেন। রাত্র দশটার পর সেই দোকানেই আশ্রয় নিতাম।

যা হোক কাল বিলম্ব না করে 'আহার বাসস্থান ফ্রী"র ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী এবং বড় বড় গাড়ী দেখে একটু যেন ভরসা হল।

বাইরের ঘরে গিয়ে বসেছি এমন সময় ৪৬।৪৮ বৎসরের একজন প্রবীণ এলেন। তাঁকে নমস্কার করে নিজের আবেদন জানাতে তিনি বসলেন। আমাকেও বসতে বলে আমার শিক্ষা শিক্ষকতা ইত্যাদি একে একে জানতে লাগলেন। এই সময় আট নয় বৎসরের একটি বালক ঘরে এসেই প্রশ্ন করল—পিসেমশাই, ইনি বুঝি আমার মাষ্টার?

ভদ্রলোক বল্লেন, এঁকে তোর পছন্দ হয়?

আমার মুখপানে চেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমার হাত ধরে ছেলেটি বল্লে, আসুন মাষ্টার মশাই। ওইটা আমার পড়বার ঘর। আমাকে রবি বলে ডাকবেন বুঝলেন। আমার নতুন সব বই এসেছে দেখবেন আসুন। এই বলে সে যেন আর বিলম্ব করতে চাইল না। আমায় টানতে লাগল।

আমি যাব কিনা ভাবছি, ভদ্রলোক বল্লেন, যখন পছন্দ হয়েছে তখন আর কারো আপত্তি নেই, আপনি যান।

ভদ্রলোকের অনুমতি পেয়ে বালকটির পড়ার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ঘর দেখে আনন্দ হল; হিংসাও যে হল না এমন নয়। আলো এবং ঘরের অভাবে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিনই আমার পড়া হত না।

বড়লোকের বাড়ী, বড়লোকের ছেলে পড়াটাও তেমনি বড়লোকের মত।

সব চেয়ে বেশী আনন্দ হ'লো এই ছাত্রটিকে পেয়ে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কিন্তু পল্লীগ্রামের হাব-ভাব মোটেই নেই; আবার সহরের ছেলেদের মত জ্যাঠামশাইও নয়। কথাগুলি যেমন মিষ্টি তেমনি সহজ সরল। পরকে এত শীঘ্র আপনার করে নিতে আমি আর কখনও দেখিনি। আমি যেন বালকটির কতকালের চেনা। নতুন বইগুলো সম্মুখস্থ টেবিলে মেলে দিয়ে আর চতুর্দ্দিক ঘুরে অনর্গল বকে যেতে লাগল। গত প্রমোশান থেকে শুরু করে দেশের বাড়ীর বাগানে ভীমরুলের চাকে ঢিলমারা পর্য্যন্ত বসে লাফিয়ে নেচে একে একে সব বলে গেল। ঘণ্টা দুই পরে বাইরে এসে রবির পিসেমশায় সঙ্গে ক্ষণিক কথাবার্ত্তা বল্লাম। জানতে পারলাম তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ছেলেদের কেউ বিলেতে কেউ বিদেশে বড় চাকুরে। দুই মেয়ে স্কুল কলেজে পড়ে। নাম বল্লেন সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী। রবিন তাঁর বড় শালার ছেলে—জমিদার পুত্র; পিতা কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ মারা গেছেন। রবীনের তিন কাকা বর্ত্তমান—তাঁরা সবাই দেশে থাকেন।

রবীনের যখন জন্ম হয় তখন তার মা'র কি একটা কঠিন অসুখ ছিল। তাই ডাক্তারদের পরামর্শে শিশুকে মায়ের কাছ ছাড়া করা হয়। সেই থেকে রবীন তার পিসিমার কাছে মানুষ। তাই বালক তার মার চেয়ে পিসিমাকেই বেশী চেনে।

বালকের মা প্রায়ই দেশের বাড়ীতে থাকেন। বিরাট সংসার এবং তিনিই সংসারের গিন্নি। সুতরাং সংসার ফেলে যখন তখন আসা যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মাঝে মাঝে পুত্রকে দেখতে আসেন।

একে একে সব বলে সুরেনবাবু উঠলেন, বল্লেন, তাহলে আপনি আপনার জিনিষপত্র সব নিয়ে আসুন। আপনার বিছানা-পত্র—

গৃহ শিক্ষকতার বিনিময়ে যিনি আহার ও বাসস্থান দিচ্ছেন তাঁর কাছে লুকাবার আর কিইবা রইল; বল্লাম, বিছানাপত্র আমার কিছুই নেই।

আচ্ছা আচ্ছা তার জন্যে ভাবতে হবে না—সে সব আমরাই ঠিক করে দেব, আপনি এসে যান। এই বলে ভদ্রলোক বিদায় হ'লেন। আমিও বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম।

(২)

প্রথমদিন পড়াতে বসেই বুঝলাম ছাত্রটি মেধাবী। ভারি ভাল লাগে। সব কিছু শিখবার ভারি আগ্রহ। জেঠামো করতে জানে না। তর্ক করতেও শেখেনি।

মাসখানেকের মধ্যে রবীন আমার এত অনুগত হয়ে পড়ল যে একদিন সুরেনবাবু হাসতে হাসতে বল্লেন, আপনি আমাদের বাড়ী আসবার পূর্ব্বে একজন টিউটর ছিলেন, কিন্তু রবীন তাঁর এতখানি অনুগত ছিল না। এখন দেখতে পাই খেতে বল্লে আপনাকে জিজ্ঞেস না করে খেতে চায় না। বেড়াতে যাবে তাও আপনাকে জিজ্ঞেস করা চাই। সেদিন বাড়ীর মেয়েরা ছবি দেখতে গেল, ও বললে মাষ্টার মশাই না বল্লে আমি যাব না। সবাই চলে গেল ও আপনার অপেক্ষায় বাড়ী শুয়ে রইল। আর দেখতে পাই রাত্রদিনই রবীন আপনার পাছ পাছ লেগেই আছে। তাই মনে হচ্ছে ওকে মানুষ করার দায়িত্ব ঈশ্বরই আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন—

বললাম, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ছেলেটিকে আমার ভারি ভাল লাগে।

সুরেনবাবু বললেন, যদি মানুষ করতে পারেন, আমার মনে হয় ও আপনাকে কখনও ভুলবে না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে রবীন প্রথমে আমার ঘরে এসে বল্লে, third teacher আজ আসেন নি বলে Headmaster মশায় কখন যে খপ করে classএ ঢুকেচেন আমি তা জানতেই পারি নি। 'ছোটদের দপ্তর' পড়তে পড়তে এমন মুগ্ধ হ'য়েছিলুম। Headmaster মশাই ওদিকে কখন যে dictation দিতে সুরু করেছেন

টেরও পাই নি। তাড়াতাড়ি সব বন্ধ করে খাতা পেন্সিল নিয়ে লিখতে সুরু করলুম। প্রথমে দেড় লাইন লিখতে পারিনি। পরে আবার সেটা লিখে ফেললুম। একটা মাত্র ভুল গেছে। এই বলে খাতাখানি আমায় দেখিয়ে বল্লে, আজ পরিমল বলে ছেলে Assistant Headmaster মশার কাছে আচ্ছা বেত খেয়েছে। জানলেন মাষ্টার মশাই ছেলেটা ভারি অসভ্য। এই বলে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে পুনরায় বল্লে, মাষ্টার মশাই বিশ্বনাথের মা মারা গেছে। সে আমাদের ক্লাশের থার্ড বয়। তার বাবা আমাদের স্কুলের fourth teacher। বিশ্বনাথরা খুব গরীব। আমি ওকে প্রত্যেক বছর বই খাতা দিয়ে থাকি। ওর মা মারা গেছে। তাই আজ আমি ক্লাশের সবাইকে, টিফিনের সময় বলেছি চাঁদা তুলে দিতে হবে। আমি ওকে পঞ্চাশ টাকা দেব বলেছি। মা এলেই মার কাছে চাইব। এই বলে আমার হাত ধরে রবীন বল্লে, মাষ্টার মশাই, আমার মা এই ঘরের জন্যে অনেক টাকা দেয়। আমার মাকে দেখেন নি আপনি। শিগ্‌গিরই আসবেন। আমি কালপরশু মাকে লিখব।

বালক আপন মনে আরও কত কথা বকে গেল। স্কুল থেকে ফিরে প্রথমে আমার ঘরে তার আসা চাই। আমি বাড়ী থাকলে তার আর আনন্দের সীমা থাকে না। আর না থাকলে মুখটা কাঁচুমাঁচু করে নিজের ঘরে গিয়ে বসে পুস্তকের পাতা উল্টাতে সুরু করে; খেতে ডাকলে বলে আমার যেন মোটেই ভাল লাগছে না। যতক্ষণ আমি না ফিরব, ততক্ষণ সে বাড়ী থেকে নড়বে না। তারপর আমি ফিরে এনে আমার কাছে এসে সে তার বক্তব্য শেষ করবে, তারপর অন্য কাজ।

দিন পনেরো পরে সেদিন বিকেলবেলা রবীন এসে বল্লে, মাষ্টার মশায় কাল আমার মা আসবেন। আমাকে গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে যেতে হবে। বললাম, যেও।

রবীন বললে, আটটার গাড়ীতে আসবেন। আমাকে তা হ'লে ঠিক সাড়ে সাতটায় এখান থেকে যেতে হবে কেমন? আমাদের বাড়ী থেকে গাড়ীতে করে ষ্টেশন যেতে ঠিক আধ ঘণ্টা লাগে। গাড়ী যদি লেট্ হয় তবেই সেখানে গিয়ে বসে থাকতে হবে। মা এলে আপনার জন্যে কি কি চাইব মাষ্টার মশাই?

হেসে বললাম, তুমি কি পাগল রবি? আমার জন্যে কি চাইতে যাবে তাঁর কাছে। তোমার কিছু চাইতে হবে না।

রবি তার পা দুটো দুলিয়ে খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল। বললাম, তোমার মা আমার খাবার থাকবার জায়গা দিয়েছেন; আমার যা যখন দরকার হ'চ্ছে দিচ্ছেন—তবে আবার কি চাইতে যাবে? অমন পাগলামি কর না রবি। আমার যা দরকার হবে আমি তা নিজেই চাইব।

রবি বললে, তবে মা এলে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব কেমন?

হাসতে হাসতে বললাম, পরিচয়ের দরকার কি। আমার যা দরকার পড়ে তা ত আমি তোমার কাছ থেকেই পাই। সেদিন একটা মশারির কথা বলতে তুমি তোমার পিসেমশার সঙ্গে গিয়ে মশারির সঙ্গে আরো কত জামা কাপড় নিয়ে এলে। তবে আর মার কাছে যাবার কি দরকার। রবি আমার সঙ্গে তর্ক করে না। এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করে বললে, পরশুদিন মিউজিয়ামে যেতে হবে কিন্তু—টুপ করে বেরিয়ে গেলে আমিও আপনার পাছ পাছ ছুটব। এই বলে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

(৩)

পরদিন সন্ধ্যায় রবীনকে আর পড়াতে পারলাম না। তার মা এসেছেন এই আনন্দে সে আমার একখানা হাত চেপে ধরে বলে বসলো, আমাকে আজ আর পড়তে বলবেন না মাষ্টার মশাই। আমি কাল সকালে সব পড়া করে দেব।

আমি তা জানতাম। রবির মাথা ভাল; ঘণ্টা দুই পড়লেই তার স্কুলের পড়া তৈরী হ'য়ে যায়। তাকে ছুটি দিলাম। কিন্তু নিজে ছুটি পেলাম না। সে আমার সম্মুখে জেঁকে বসে বকতে সুরু করল। তার মা কিভাবে

COUNCIL OF THE STUDENTS' UNION

(MORNING DEPARTMENT)

1947-48

Sitting (from left)—Arati Chakravarti (Cultural Secretary), Prof. Arundhati Sen (President), Principal Kalidas Sen, Bela Ganguly (General Secretary), Pratima Sen Gupta (Assistant General Secretary).

Standing (from left)—Bithi Sen, Dipali Banerjee (Social Secretary), Puspita Majumdar, Meera Arora (Games Secretary), Geeta Sen, Anjali Ball (Common Room Secretary), Bijaya Das Gupta (Assistant Cultural Secretary).

INTER COLLEGIATE SPORTS COMPETITION

(MORNING)

JANUARY. 1948

Sitting (from left)—Amita Das (Physical Instructress), Professor Arundhati Sen, Principal Kalidas Sen, Jagadish Chandra Chakravarty (Physical Instructor).

Standing (from left)—Bani Chakravarty, Bela Ganguly, Nilima Ganguly (*Individual Champion*), Ira Mukherjee, Iva Sarker, Anima Chakravarty.

এলেন কি কি খাদ্য বস্তু কার কার জন্য নিয়ে এলেন। এখানে কদিন থাকবেন, কি কি করবেন। কোন কোন আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে যাবেন ইত্যাদি নানা রকম পরিচয় দিল। তারপর বললে, আপনার কথাও বলেছি আমি। আপনি বলতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু মা যখন এল তখন আর না বলে কিছুতেই পারলাম না মাষ্টার মশাই। আমি আপনার জন্য তাঁর কাছে কিছু চাই নি। শুধু বলেছি মা মাষ্টারমশাইকে আমি খুব ভাল বেসেছি আর উনিও আমায় ভারি ভালবাসেন। মা বললেন, বেশ বাবা, অমনি তাঁকে ভালবাসা শ্রদ্ধা দেখিও তাঁর কাছ থেকে নানা রকম শিখে নিও তিনি যখন যা বলবেন তাই শুনবে। তাঁর যখন যা দরকার তুমিই দিও। আমি কিন্তু আর কিছু বলিনি।

চুপ করে বসে রইলাম। রবীন অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল। তারপর উঠে বললে, আপনার জন্য আজ এত এত খাবার আছে। মা যখন আসেন তখন এত এত খাবার সবাইকে খেতে হয়। সেই জন্যে বেবীদি বলেন পাড়াগেঁয়ে লোকরা কেবল খেতেই জানে। একটুতে তাদের পেট ভরে না—তাদের সব ধামা ধামা চাই। মা তাই বেবীদিকে বলেছিল চা আর বিস্কুট খেয়ে ওই ত তোদের শরীরের দশা। খাওয়া যার আছে শরীরও তার আছে। সহরের বেশীদিন বাঁচেনা ওই জন্যে। ওই নিয়ে মার সঙ্গে বেবীদি ঝগড়া করেছিল! আর মা বেবীদির পিঠে এক কিল বসিয়ে দিয়েছিল!

বললাম, রবি তুমি তোমার মার কাছে যাও। কাল সকালে এসে পড়ে নেও।

রবি নাচতে নাচতে চলে গেল।

পরদিন রবি সাড়ে দশটায় স্কুলে গেল। আমিও আহারান্তে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতে সুরেন বাবু বাইরে এসে বললেন, রবির বড় অসুখ মাষ্টার মশাই।

অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে তার মুখপানে চাইতে তিনি বললেন, স্কুল থেকে এসে খেতে যাবে এমন সময়ে মা মা বলে গলা টেনে দু'বার বমি করলে। তারপর থেকে অবিরাম ভেদবমি সুরু হয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, ডাক্তার?

সুরেন বাবু বললেন, ডাক্তার চৌধুরীকে ফোন করে গাড়ী পাঠিয়েছিলাম। তিনি আসছেন। রবি সেই থেকে মাষ্টার মশাই মাষ্টার মশাই বলে চেচাচ্ছে। ওই শুনুন। যান একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আসুন। আমি এক্ষুনি এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করতে যাব। রবির কাকাদের জানান দরকার। ওই বলে তিনি রবির ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন। ঘরে রবির পিসিমা পিশতুত বোনের ঝি চাকর আরও দুই একজন কে কে রবির চতুর্দ্দিক ঘিরে ছিলেন। আর তাদের মাঝখানে পুত্র কোলে কোরে রবির মা বিধবা উমা। রঙিন শাড়ী ছাড়া যে কোনদিন পরত না কপালে এতবড় একটা টিপ না হলে যার মুখের সৌন্দর্য্য খুলত না, রাঙ্গের ফুল না হলে যার খোপা বাঁধা হত না—আজ সে সাদা একখানা ধান পরে আছে।

ঘরের ভিতর যে কেমন করে ঢুকব এই চিন্তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিলাম। রবি আমার পানে চেয়েই কেঁদে উঠলো,—মাষ্টার মশাই, মাষ্টার মশাই। উমা আমার মুখ পানে চেয়ে সিক্ত কণ্ঠে বললে, বীরুদা একে একবার দেখ। এই বলে রবীনের পিসিমার পানে চেয়ে বললে, উনি আমার হরেন জ্যাঠামশায়ের ছেলে বীরুদা।

সুরেনবাবু পিছন থেকে বল্লেন, যান মাষ্টার মশাই। আপনার জন্যে রবি ভারি কাতর হয়ে পড়েছে। আপনি ওর কাছে বসে দেখা শুনা করুন আমি এদিককার কাজ গুলো সেরে আসি। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

গিয়ে বসলাম। রবির হাত পা, মাথা ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। ডাক্তার এসে সেলাইন-ইন্‌জেকসন করে অন্যান্য ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে বল্লেন আমার একজন assistant রাত্রে থাকবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে জানানো দরকার। এই বলে বাইরে গিয়ে সুরেন বাবুর সঙ্গে যে আর কি কি বলে গেলেন তা আমার কানে এল না।

তারপর সমস্ত রাত রবিকে নিয়ে মরণের সঙ্গে যুদ্ধ। একদিকে উমা, আর একদিকে আমি; আর পাশের ঘরে ডাঃ চৌধুরীর সেই assistant যে উমাকে নিজের জীবন থেকে চিরকালের জন্য মুছে ফেলেছিলাম তাকে যে একটা রাত্রির জন্য এই অবস্থায় এত কাছে পাব এ ধারণা কোন দিনই হয় নি। মনে মনে ঈশ্বরকে বললাম, হে ঈশ্বর এটা কি তোমার পরিহাস না উপহাস? প্রিয়জনকে কাছে এনে দেওয়ার নমুনা কি এই।

এই একটা রাত্রি আমার জীবনে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে গেছে।

রাত্র একটার সময় রবির আর যখন সাড়া পাওয়া যায় না, তখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে উমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই বারবার কেঁদেছিলাম। আমার নিজের দিক দিয়ে ত আর কোন সান্ত্বনাই ছিল না।

একটার পর এক এক করে যখন চারটে বাজল তখন মনে হলো ডাক্তার যেন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। উমার চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছিল। সাড়ে চারটায় যখন উমা বলে ডাকলাম, তখন রবির সকল যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেছে—আমার কোলে সে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়েছে।

"বীরুদা আমার রবি কোথায় গেল" এই বলে উমা আমার কোলের উপর আছড়ে পড়ে মূর্চ্ছিত হল।

পরের ঘটনা লিখতে কষ্ট হয়। বেলা হলে যখন শ্মশান যাত্রার আয়োজন চলছে, সুরেন বাবু বললেন, মাষ্টার মশাই রবির জন্য আপনি যা করলেন আমরা মৃত্যু পর্য্যন্ত কেউ তা ভুলব না। রবির কাকারা এখনো পর্য্যন্ত এসে পৌছুতে পারলেন না। বেলাও অনেক হয়েছে—শেষ কাজটুকু আজ আপনাকেই করতে হবে।

আট নয় বৎসরের বালকের মৃতদেহ দুই হাতে ধরে বুকে করেই নিয়ে চললাম। পথ চলতেই ভাবতে লাগলাম কার ছেলে কোলে কোরে কে নিয়ে যায়। কার চোখের জল কার চোখ দিয়ে পড়ে।

ভাঁটা

সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় বর্ষ সাহিত্য

মন ঘুরে পড়ে মাঝে মাঝে আসন্ন হয়ে
এক অজানা ভয়ে।
ভাঁটা পড়ে যায় জীবনের স্রোতে,
মহাসমুদ্র হতে
আসেনাক জোয়ার।
তরণী চলেনাক আর
আবদ্ধ হয়ে স্বল্প জলে
বৈচিত্রহীনতার উষর চরে, দিন চলে
এক ধেয়ে। এখানে নেই সবুজের সমারোহ,
সংগীর বিরহ প্রাণে বাজে অহরহ।
ফুলপাতা ঝরে বনে বনে,
ক্ষণে ক্ষণে
ধূসর প্রান্তরে বয় উষ্ণ বাতাস,
সূর্য্যের তীক্ষ্ণ তেজে পুড়ে যায় নির্মেঘ নীল আকাশ,
নদীচরে চলেনাক কাশ।
সুন্দর সুস্থ জীবনের সোনালি স্বপ্ন নিয়ে
কখন জোয়ার আসবে প্রাণে
তাই, তাকিয়ে আছি মহাসমুদ্র পানে।

ভাববাদের তাৎপর্য্য ও প্রকারভেদ

অধ্যাপক শ্রীকাত্যায়নী দাস ভট্টাচার্য্য

"এই দৃশ্যমান বিশ্বের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন একটি চেতনস্বভাব পূর্ণসত্তা মানব আত্মার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। মানুষ সেই পূর্ণ সত্তারই সসীম স্ফূর্ত্তি। জড় প্রকৃতি দৃশ্যতঃ মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আবর্শের পরিপন্থী মনে হইলে ও প্রকৃতপক্ষে তাহারই আত্মোন্নতির অপরিহার্য্য সহায়ক—তাহারই আধ্যাত্মিক উর্দ্ধগতির সোপান।" ইহা-ই ভাববাদের বাণী। এই বাণী বহন করে বলিয়াই ভাববাদের এত জনপ্রিয়তা। প্রকৃতির দুর্যোগে বিপন্ন বিস্তস্ত মানুষ ভাববাদের উদাত্ত আশ্বাসে বিশ্বাস করে—ভাববাদের আশ্বাসে তাহার ভরসা হয়—বিপদ ক্ষণস্থায়ী, জীবনের দুর্যোগ তাহারই আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে ভগবৎপ্রেরিত আশীর্ব্বাদ।

কিন্তু ভাববাদ শুধু বাণী বহন করিয়াই ক্ষান্ত নহে। মতবাদ রূপে ভাববাদের সত্যতা প্রমান ব্যাপারে ভাববাদীরা এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করে। জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহারা জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পায়। কোন কিছুর জ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইটি বস্তুর প্রয়োজন। যে জানিতেছে সে জ্ঞাতা এবং যাহাকে জানিতেছে সে জ্ঞেয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইটি জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব নাই, জ্ঞেয় ভিন্নও জ্ঞাতার অস্তিত্ব নাই। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এতদুভয়ই জ্ঞানব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ। জ্ঞানব্যাপারটি আধ্যাত্মিক বা চেতন-ব্যাপার। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—উভয়ই আধ্যাত্মিক বা চেতন-ব্যাপারের অঙ্গরূপে আধ্যাত্মিক বা চেতনস্বরূপ। এই বিশ্বে যাহা কিছু অস্তিত্বসম্পন্ন তাহাই জ্ঞেয়, জ্ঞানের বিষয়বস্তু, জ্ঞানের অঙ্গ। যাহা জ্ঞানের অঙ্গ তাহাই অধ্যাত্ম বা চেতনস্বরূপ। সুতরাং এই দৃশ্যমান জগৎ—যাহা জড় বলিয়া প্রতিভাত হয়—মূলতঃ চেতনস্বরূপ, অধ্যাত্মস্বভাব।

এক্ষেত্রে আপত্তি উঠে। এই বিশ্বে যাহা কিছু অস্তিত্বসম্পন্ন তাহাই জ্ঞেয়, জ্ঞানের বিষয়বস্তু—ইহা কি সত্য? এই বিশ্বে অগণিত বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান, সবই কি কাহারও জ্ঞানের বিষয়বস্তু? পৃথিবীর মধ্যবিন্দু তো অস্তিত্বসম্পন্ন কিন্তু ইহা কি কোন ব্যক্তির জ্ঞানের বিষয়-বস্তু বা জ্ঞেয়? সুদূর আকাশে কত অজ্ঞাত জ্যোতিষ্ক বিদ্যমান কে তাহার খোঁজ রাখে! সমুদ্রের গর্ভে কত রত্নাদি লুকায়িত, নির্জ্জন অরণ্যানীতে কত পুষ্প প্রস্ফুটিত কেহ কি এইসকল বস্তুকে জানিতেছে? সুতরাং যাহা কিছু অস্তিত্বসম্পন্ন তাহাই জ্ঞানের বিষয় বস্তু বা জ্ঞেয়রূপে বিদ্যমান এইরূপ অনুমান করা কি ন্যায়সঙ্গত?

এই আপত্তির উত্তরে ভাববাদীরা বাস্তব অস্তিত্ব ও কাল্পনিক অস্তিত্বের পার্থক্য লইয়া তর্ক তোলে। কোন বস্তুর অস্তিত্ব বাস্তব কি কাল্পনিক জানিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হয়? পৃথিবীর মধ্যবিন্দু একটি কাল্পনিক বস্তু, বাস্তব জগতে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই এইরূপ কেহ সন্দেহ তুলিলে সন্দেহকারীর সন্দেহ-নিরসন পূর্বক পৃথিবীর মধ্যবিন্দুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় বস্তুটিকে সন্দেহকারীর প্রত্যক্ষগোচর করা। অর্থাৎ কোন একটি বস্তুর অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিতে হইলে বস্তুটিকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়বস্তু করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যে বস্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইতে পারে না তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। জার্মান দার্শনিক কান্টের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়—বাস্তব তিনশত ডলার এবং কাল্পনিক তিনশত ডলারের একমাত্র মাত্র পার্থক্য এই যে, বাস্তব ডলারগুলিকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি কিন্তু কাল্পনিক ডলারগুলি প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানই বাস্তব ও কাল্পনিক অস্তিত্বের একমাত্র নির্ণায়ক। পৃথিবীর মধ্যবিন্দু, সুদূর আকাশের অজ্ঞাত জ্যোতিষ্ক, সমুদ্রগর্ভে লুকায়িত রত্ন, গহন অরণ্যানীর প্রস্ফুটিত পুষ্প যদি কাল্পনিক না হইয়া বাস্তবিকই অস্তিত্বসম্পন্ন হইয়া থাকে তবে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুরূপে, জ্ঞানের জ্ঞেয়রূপেই, ইহারা অস্তিত্ববান। যাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের অগম্য তাহার উপর অস্তিত্ব আরোপ অর্থহীন।

প্রশ্ন উঠে, কাহার প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু হইয়া বস্তুকে অস্তিত্বসম্পন্ন হইতে হয়? কোন সসীমব্যক্তির জ্ঞানের বিষয়বস্তুরূপে থাকিতে হইলে বিশ্বে অতি অল্প বস্তুই অস্তিত্বসম্পন্ন হইতে পারে কারণ এই বিরাট বিশ্বের অতি নগণ্য অংশমাত্র সসীম জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে ভাববাদীরা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল ভাববাদী বলে—এই জগতে যাহা আছে তাহা সসীমজ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়রূপেই অস্তিত্ববান, সসীমজ্ঞাতার জ্ঞানবহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব কাল্পনিক। যাহা আমি, তুমি বা আমাদের মত সসীমজ্ঞাতা জানিতে পারে না তাহার অস্তিত্ব কল্পনা অর্থহীন। এই সম্প্রদায়ের ভাববাদকে বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। বিখ্যাত দার্শনিক বার্কলে এই মতবাদের প্রবর্ত্তক। বিজ্ঞানবাদ মতে সসীম জ্ঞাতা ও তদীয় জ্ঞানের বিষয়রূপী ভাবরাজি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু অস্তিত্ববান নহে। কোন বস্তুকে অস্তিত্বসম্পন্ন হইতে হইলে কোন সসীম জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়রূপে বিদ্যমান থাকিতে হইবে।

অপর এক সম্প্রদায়ের ভাববাদী বলে যাহা আছে তাহা যদি শুধু সসীমজ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়রূপেই থাকে তবে বিরাটবিশ্বে অতি অল্প বস্তুই অস্তিত্ববান থাকিতে পারে, কারণ সসীম জ্ঞাতার জ্ঞান পরিধি বিশ্বের ব্যাপকত্বের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। সসীমজ্ঞাতার জ্ঞান-বহির্ভূত হইয়াও কোন অসীম জ্ঞাতার জ্ঞেয়রূপে এই বিরাট বিশ্বের বস্তুনিচয় অস্তিত্ববান। সেই অসীমজ্ঞাতাই ঈশ্বর। বিশ্বের যাহা কিছু অস্তিত্বসম্পন্ন তাহাই সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়বস্তু, তাঁহার জ্ঞানবহির্ভূত কোন বস্তুর অস্তিত্ব অর্থহীন। তথাকথিত পৃথিবীর মধ্যবিন্দু, সুদূর আকাশের অজ্ঞাত জ্যোতিষ্ক, সমুদ্রগর্ভের লুক্কায়িত রত্ন বিজনঅরণ্যানীর প্রস্ফুটিত পুষ্প প্রভৃতি কোন সসীম জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও অসীমজ্ঞাতা ঈশ্বরের জ্ঞানের জ্ঞেয়রূপে বিরাজমান। এই সম্প্রদায়ের ভাববাদকে অধ্যাত্মবাদ বা বস্তুতান্ত্রিক ভাববাদ বলা

হইয়া থাকে। ফিক্‌টে, শেলিং, হিগেল, ব্রেডলে প্রমুখ মণীষিগণ এই মতবাদের প্রবর্তক।

বিজ্ঞানবাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যবর্তী এক প্রকার ভাববাদ চিন্তাজগতে বিশেষভাবে পরিচিত। কেহ কেহ এই মতবাদটিকে অধ্যাত্মবাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন কিন্তু কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকায় ইহাকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া সঙ্গত। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্ট এই মতবাদের প্রবর্তক। এই ভাববাদ মতে বিশ্বের মূল সত্তা অধ্যাত্মস্বরূপ, কিন্তু সেই সত্তা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়বস্তু নহে। আমাদের জ্ঞান মূল সত্তার আভাস বা দৃশ্যমানরূপ জানিয়াই নিরস্ত। সেই সত্তা দেশ-কাল, কার্য-কারণ, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই রূপান্তরীকরণের জন্য আমাদের মনই দায়ী, কারণ কোন বস্তুর জ্ঞান নিষ্পন্ন করিতে গেলে বস্তুর স্বভাবকে কতকগুলি সম্বন্ধ দ্বারা রূপান্তরিত না করিয়া মন বস্তুর জ্ঞান নিষ্পন্ন করিতে পারে না। মূল সত্তার প্রকৃত রূপ আমাদের জ্ঞানের অগম্য, দৃশ্যরূপ বা আভাস মাত্র আমাদের জ্ঞানগম্য। সুতরাং বিশ্বের মূলসত্তা—যাহা অধ্যাত্মস্বভাব—আমাদের জ্ঞাননির্ভরশীল নহে, কিন্তু সত্তার দৃশ্যরূপ বা আভাস আমাদের জ্ঞাননির্ভরশীল। এই প্রকার ভাববাদকে আভাসিক ভাববাদ বা আভাসবাদ বলা হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানবাদ

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে নিউটন, গেলিলিউ, জন্ লক্ প্রভৃতি মণীষিগণ জড়-প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের যে চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন, বিজ্ঞানবাদ তাহারই ক্রমপরিণতি। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক জন্ লক্ জড় বস্তুর গুণগুলিকে মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মুখ্যগুণগুলিকে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ এবং গৌণগুণগুলিকে প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ বর্ণনা করেন। বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, রস, প্রভৃতি গুণগুলি বস্তুর গৌণগুণ, ইহারা জড় বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ নহে, ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে কোন প্রত্যক্ষকারীর প্রত্যক্ষের উপর। কোন প্রত্যক্ষকারী প্রত্যক্ষ না করিলে এই সকল গুণ অস্তিত্বহীন। বাহ্যজগতের বর্ণহীন ঈথরতরঙ্গ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসারে চক্ষুরিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির গোচরীভূত হইলে বর্ণ দৃশ্যমান হয়। চক্ষুর গঠন ভিন্নপ্রকারের হইলে ঈথরতরঙ্গ হইতে বর্ণপ্রত্যক্ষ হয় না। বাহ্যের বর্ণপ্রত্যক্ষ হয় না। প্রকৃতির সপ্তবর্ণ ইহার নিকট অস্তিত্বহীন। বর্ণহীন ঈথরতরঙ্গ একটি বিশেষ গঠনের চক্ষুকে উদ্বেলিত করিলেই শুধু বাহ্যজগতে বর্ণপ্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষকারীর প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে বহির্জগতে বর্ণের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং বর্ণ জড়বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ নহে, দৃশ্যমান গৌণগুণমাত্র, ইহা প্রত্যক্ষসাপেক্ষ। সেইরূপ শব্দহীন বায়ুতরঙ্গ আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়কে উদ্বেলিত করিলে শব্দপ্রত্যক্ষ হয়। কোন প্রত্যক্ষকারীর অবিদ্যমানে শব্দের অস্তিত্ব নাই কারণ বস্তুজগতে শুধু বায়ুতরঙ্গের মাত্র অস্তিত্ব বর্তমান। সেইরূপ গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি গুণও প্রত্যক্ষসাপেক্ষ। বস্তুজগৎ এই সকল গুণ দ্বারা গুণান্বিত দৃশ্যমান হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই সকলগুণ আমাদের প্রত্যক্ষ নির্ভরশীল, বহির্জগৎ এই সকল গুণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কতকগুলি সূক্ষ্ম জড় কণিকা বা পরমাণু দ্বারা জড় জগৎ গঠিত। এই পরমাণুগুলির কোন বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, রস নাই। যখন এই সকল পরমাণু সমবেতভাবে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসারে আঘাত করে তখনই বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, রস প্রভৃতি গৌণগুণগুলি আমাদের সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। সূক্ষ্ম জড় কণিকা বা পরমাণুগুলি শুধু কতকগুলি মুখ্য গুণ দ্বারা গুণান্বিত। বিস্তৃতি, অভেদ্যতা ও গতি এই সকল মুখ্য গুণ। জড় কণিকাগুলি যত ক্ষুদ্রই হউক, প্রত্যেকটি কণিকাই কতকস্থানে বিস্তৃত, বিস্তৃতিহীন জড়কণিকা চিন্তার অগম্য। সেইরূপ প্রত্যেকটি জড়কণিকা অন্য কণিকা দ্বারা অভেদ্য, এবং গতিশক্তিসম্পন্ন। এই সকল মুখ্যগুণ ছাড়া জড়বস্তুকে আমরা কল্পনা করিতে পারি না। মুখ্য গুণগুলি জড়ের অন্তর্নিহিত গুণ, সুতরাং প্রত্যক্ষসাপেক্ষ নহে। কেহ প্রত্যক্ষ না করিলে ও জড় জগৎ মুখ্যগুণ দ্বারা গুণান্বিত। কিন্তু গৌণগুণগুলি প্রত্যক্ষসাপেক্ষ এবং জড়ের স্বভাব বহির্ভূত।

জন্ লক্, নিউটন, গেলিলিউ প্রবর্তিত মুখ্য ও গৌণগুণের পার্থক্যের ভিত্তিকে অস্বীকার করিয়া জর্জ বার্কলে উভয়বিধ গুণকেই প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। ইনি বহুবিধ যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন যে, গৌণগুণ হইতে পৃথকভাবে মুখ্য গুণের অস্তিত্বানুমান সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মুখ্য ও গৌণ এই উভয়বিধ গুণ দ্বারা গুণান্বিতরূপে জড় জগৎ আমাদের প্রত্যক্ষে প্রতিভাত। মুখ্যগুণগুলির গৌণগুণের মতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সেইহেতু প্রত্যক্ষসাপেক্ষ। বিস্তার ও অভেদ্যতা এই সকল মুখ্যগুণ স্পর্শপ্রত্যক্ষসাপেক্ষ, কারণ বস্তুর বিস্তৃতি ও অভেদ্যতা আমরা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি এবং স্পর্শ ব্যতিরেকে এই গুণদ্বয় অস্তিত্বহীন। অধিকন্তু মুখ্যগুণগুলিকে গৌণগুণের সঙ্গে সংযুক্তরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়। সুতরাং মুখ্যগুণগুলি হইতে গৌণগুণকে পৃথকরূপে কল্পনা করা অর্থহীন। গৌণগুণের ন্যায় মুখ্যগুণও প্রত্যক্ষসাপেক্ষ, প্রত্যক্ষকারীর প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে মুখ্য কি গৌণ কোন গুণের অস্তিত্ব নাই। প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় গুণসমষ্টিদ্বারা গঠিত। এতদতিরিক্ত কোন জড়সত্তার কল্পনা যুক্তিহীন। গুণসমষ্টি প্রত্যক্ষসাপেক্ষ হওয়াতে গুণসমষ্টিদ্বারা গঠিত বস্তুও প্রত্যক্ষসাপেক্ষ। সুতরাং প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুরূপে বস্তুনিচয়ের অস্তিত্ব বর্তমান, প্রত্যক্ষবহির্ভূত বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই। বার্কলে বলেন, কতকগুলি সত্য আমাদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকটিত। এই বিশ্ব সংসারের বস্তুনিচয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়রূপে অস্তিত্ববান, প্রত্যক্ষের বহির্ভূতরূপে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই।

সংক্ষেপতঃ বার্কলের মতে গুণসমষ্টিদ্বারা বস্তুর গঠন, গুণগুলি প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ হওয়ায় বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষসাপেক্ষ। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, বিস্তার, গতি প্রভৃতি গুণ দ্বারা বস্তু গঠিত। এই সকলগুণ যতক্ষণ কোন প্রত্যক্ষকারীর গোচরীভূত হইতেছে ততক্ষণ অস্তিত্বসম্পন্ন, প্রত্যক্ষকারীর অগোচরে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। একমাত্র প্রত্যক্ষকারী এবং তাহার গোচরীভূত বস্তুসকলই অস্তিত্ববান, এতদতিরিক্ত কোন সত্তার অস্তিত্ব-কল্পনা অর্থহীন। ইহাই বিজ্ঞানবাদের মূলকথা।

আভাসবাদ

বার্কলেপ্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানবাদ মতে প্রত্যক্ষকারী মন ও প্রত্যক্ষের বিষয় ভিন্ন আর কিছুই অস্তিত্বসম্পন্ন নহে। যাহা কিছুর অস্তিত্ব বর্ত্তমান তাহাই কোন প্রত্যক্ষকারী মনের জ্ঞেয়রূপে বর্ত্তমান—মন এবং তাহার জ্ঞেয়বিষয় ভিন্ন অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান অর্থহীন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, যে মনের জ্ঞেয়রূপে বস্তুগুলি অস্তিত্ববান তাহা কি মনস্তত্ত্বের বিষয়রূপী ব্যক্তিমন? যাহা ব্যক্তিমন তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে গঠিত, সুতরাং ব্যক্তিমনের জ্ঞানের কোন সার্ব্বজনীনতা বা সাধারণত্ব নাই। বহির্জগৎ ব্যক্তিমনের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বহির্জগৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে এবং ফলে জ্ঞানের সার্ব্বজনীনতা বা সাধারণত্ব নষ্ট হইয়া পড়িবে। বহির্জগৎকে প্রত্যক্ষসাপেক্ষ মানসিক ব্যাপারে পরিণত করাতে বার্কলের বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাববাদীর কোন আপত্তি উঠে না। কিন্তু যে মনের প্রত্যক্ষসাপেক্ষ মানসিকব্যাপাররূপে বহির্জগৎ বর্ত্তমান সেই মন ব্যক্তিমন নহে, তাহা বিশ্বজনীন সাধারণ মন। বিশ্বজনীন মনের সন্ধান না জানিয়া বহির্জগৎকে ব্যক্তিমনের প্রত্যক্ষসাপেক্ষ করিয়া জ্ঞানকে ক্ষণস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার দোষে দুষ্ট করাতেই বিজ্ঞানবাদীর ভ্রম নিহিত। পদার্থ-বিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানগুলি আমাদিগকে যে জ্ঞান পরিবেষণ করিতেছে তাহা সার্ব্বজনীন বা সাধারণ জ্ঞান। এই জ্ঞানের সার্ব্বজনীনতা ও নিশ্চয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই জ্ঞানের অস্তিত্ব হইতেই প্রমাণ হয় যে, আমাদের ব্যক্তিমনের অন্তরালে এক বিশ্বজনীন মন ক্রিয়মান। এই মনের ক্রিয়া কতকগুলি নৈয়ায়িক নিয়মের ভিতর দিয়া প্রকাশিত। বিশ্বজনীন মন জ্ঞেয় বিষয়কে কতকগুলি সম্বন্ধ দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া জ্ঞান নিষ্পন্ন করে। বিশ্বজনীন মনের দুইটি স্থায়ী বৃত্তি বর্ত্তমান—সংবেদনীবৃত্তি ও সংবোধনীবৃত্তি। সংবেদনীবৃত্তির সাহায্যে মন বহির্জগৎ হইতে দেশ-কালসম্বন্ধ দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া জ্ঞানের বিষয় গ্রহণ করে। দেশকাল সম্বন্ধ দ্বারা রূপান্তরিত বিষয়ের উপর সংবোধনী বৃত্তির সাহায্যে মন দ্রব্যগুণ, কার্য্যকারণ প্রভৃতি আরও কতকগুলি সম্বন্ধ আরোপ করিয়া বস্তুর জ্ঞান নিষ্পন্ন করে। জগতের প্রত্যেকটি জ্ঞেয়বস্তু আমাদের নিকট দেশকাল, কার্য্যকারণ, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধের ভিতর দিয়া দৃশ্যমান হয়, কিন্তু এই সকল সম্বন্ধ আমাদের মনের আরোপিত সম্বন্ধ। মন বস্তুর জ্ঞান নিষ্পন্ন করিতে গেলেই এই সকল সম্বন্ধ আরোপ করিয়া থাকে, এই সকল সম্বন্ধ হইতে মুক্তভাবে আমরা বস্তুকে জানিতে পারি না। জগতের মূলসত্তা কতকগুলি আরোপিত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া রূপান্তরিত হইয়া আমাদের নিকট দৃশ্যমান হয়। মনের আরোপিত সম্বন্ধ হইতে মুক্তভাবে সত্তার প্রকৃতরূপ আমাদের জ্ঞানের অগম্য। জন্ম হইতে যদি আমাদের চোখে দুইটি নীলবর্ণের চশমা পরাইয়া দেওয়া হইত তবে আমরা যাহা দেখিতাম সকলই নীলবর্ণ প্রতীয়মান হইত, বস্তুর প্রকৃত রূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিত। সেইরূপ আমরা যাহা জানিতে যাই তাহাই আমাদের বিশ্বজনীন মন কতকগুলি সম্বন্ধের ভিতর দিয়া জানিয়া থাকে, এই সম্বন্ধগুলি হইতে পৃথকভাবে আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং আমরা যাহা জানি তাহাই দেশকাল, কার্য্যকারণ, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা রূপান্তরিত ভাবে জানি। আমাদের জ্ঞান বস্তুর দৃশ্যরূপেই নিবদ্ধ, বস্তুর তত্ত্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অগম্য। অর্থাৎ মূলসত্তা আমাদের মনের আরোপিত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে ভাবে প্রতিভাত হয় সেই ভাবেই আমরা ইহাকে জানি, সত্তার প্রকৃত রূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত। সত্তার দৃশ্যরূপকে অভাস বলা হইয়া থাকে। সুতরাং এই মতবাদকে আভাসবাদ বলা যাইতে পারে।

কাণ্টের আভাসবাদ বার্কলের বিজ্ঞানবাদ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। বিজ্ঞানবাদমতে জ্ঞানবহির্ভূত কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু আভাসবাদ মতে মূলসত্তা আমাদের জ্ঞানের অগম্য, আমাদের জ্ঞান সত্তার আভাসেই নিবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ বার্কলেপ্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানবাদে যে যে মনকে জ্ঞানের কর্ত্তারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা ব্যক্তিমন, যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন। কিন্তু কাণ্টের আভাসবাদে যে মনের উল্লেখ তাহা বিশ্বজনীন মন, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এক, যাহা ব্যক্তিমন বা মনস্তত্ত্বের বিষয়রূপী মনের অন্তরালে জ্ঞাতারূপে বিদ্যমান এবং যাহার স্বভাব নৈয়ায়িক নিয়মাদিতে রূপায়িত। এই বিশ্বজনীনমন আমাদের জ্ঞানগম্য দৃশ্যজগতের স্রষ্টা। তত্ত্ববস্তু এই বিশ্বজনীন মনের সংস্পর্শে আসিয়াই তদীয় সম্পর্কারোপ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া দৃশ্যরূপ ধারণ করে। সুতরাং মনই দৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা।

অধ্যাত্মবাদ বা বস্তুতান্ত্রিক ভাববাদ

দার্শনিকপ্রবর কাণ্ট মূলসত্তাকে দৃশ্যজগৎ ও তত্ত্বজগৎ এই দুইভাগে ভাগ করিয়া দৃশ্যজগৎকে জ্ঞানগম্য ও তত্ত্বজগৎকে জ্ঞানবহির্ভূত এইরূপ প্রদর্শন করার ফলে সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী দার্শনিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তত্ত্বজগৎ যদি জ্ঞানের অগম্যই হয় তবে ইহার অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি? এই প্রশ্ন হইয়া ফিক্‌টে, শেলিং, হিগেল প্রমুখ জার্ম্মান দার্শনিকগণ বিশেষ চিন্তা করেন। ফিক্‌টে সিদ্ধান্ত করেন তত্ত্বজগৎকে জ্ঞানবহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তারূপে অনুমান করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই, তথাকথিত তত্ত্বজগৎ বিশ্বজনীন-মনেরই আত্মনিক্ষেপ মাত্র। বিশ্বজনীন মন—যাহা প্রত্যেকব্যক্তিতেই ক্রিয়মান—আপনারই উপলব্ধির জন্য আপনাকেই বহির্জগৎরূপে নিক্ষেপ করে এবং আত্মনিক্ষিপ্ত বহির্জগতের সঙ্গে সংঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আত্মোপলব্ধি করে। আমরা স্বপ্নদর্শনকালে যেরূপ মানসিক ঘটনাগুলি বহির্জগতের ঘটনা বলিয়া প্রত্যক্ষ করি সেইরূপ আত্মনিক্ষিপ্ত বহির্জগৎও আত্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্রজগৎরূপে প্রতিভাত হয়। বিশ্বজনীন-মনের নৈতিক উন্নতির সোপানরূপে আত্মনিক্ষিপ্ত বহির্জগতের প্রয়োজন হয়। কোনরূপ প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। আত্মনিক্ষিপ্ত বহির্জগৎ সেই প্রতিবন্ধকের কার্য্য করিয়া বিশ্বজনীন মনকে নৈতিক উর্দ্ধগতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। বহির্জগৎ দৃশ্যতঃ দেশকালাশ্রিত স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রতিভাত হইলেও তত্ত্বতঃ ইহা আত্মারই প্রচ্ছন্নরূপ। বাহ্যপ্রকৃতি মূলতঃ আত্মস্বরূপ। ফিক্‌টেকে প্রবর্ত্তিত চিন্তাধারাকে অনুসরণ করিয়া শেলিং

অধ্যাত্মবাদকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ইনি জগতের মূল সত্তাকে অধ্যাত্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্নস্তরে সেই সত্তারই ক্রমবিবর্তন দেখিতে পান। সেই অধ্যাত্মসত্তা গতিশীল ক্রমবর্দ্ধমান স্বভাব। নিষ্প্রাণ জড়ের অন্তরালে প্রেরণারূপে, প্রাণীদের অন্তরালে প্রাণরূপে, চেতনদের অন্তরালে মনরূপে সেই অধ্যাত্মসত্তা আপনাকে বিকশিত করিতেছে। এই সত্তাই জগতের মূল সৃজনীশক্তি, বিশ্বের বস্তুসমূহ সেই সত্তা হইতেই উদ্ভূত। জড়প্রকৃতি মূলতঃ আত্মস্বভাব, আত্মারই প্রচ্ছন্নরূপ। জড়প্রকৃতি, প্রাণ ও মন মূল অধ্যাত্মসত্তারই বিকাশের বিভিন্ন স্তর। আমরা যেরূপ অচেতন অবস্থা হইতে চেতন অবস্থাতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারি সেইরূপ পরমাত্মা বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া আত্মানুভূতিতে প্রত্যাবর্তন করে। শেলিং-বর্ণিত অধ্যাত্মবাদ তখনকার ইউরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয় মতবাদরূপে গৃহীত হয় এবং অনেক কবি, সাহিত্যিক এই অধ্যাত্মবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রাণবস্তুরূপে কল্পনা করিতে থাকেন।

কাণ্ট-বর্ণিত জ্ঞানবহির্ভূত তত্ত্বজগৎকে অস্বীকার করিয়া ফিকটে, শেলিং প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ যে চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণীষী হিগেলের অধ্যাত্মবাদ ইহারই ক্রমপরিণতি। হিগেলের মতে বিশ্বের চরম আদর্শ উদ্ঘাটন করাই দর্শনের উদ্দেশ্য। চরম আদর্শ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া হিগেল লক্ষ্য করেন যে বিশ্বের প্রতিটি ঘটনা উদ্দেশ্যপূর্ণ, অপরাপর ঘটনাবলীর সম্পর্কে ইহার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। সমগ্রবিশ্ব একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যাপার, কোথাও কোন আকস্মিকতার স্থান নাই। বস্তুজগতের প্রতিটি ঘটনা বিশ্বের চরম উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইতেছে। অগ্রগতি, পরিবর্তন, চঞ্চলতাই বস্তু-জগতের ধর্ম্ম। পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া বিশ্বের প্রতিটি বস্তু অবিকশিত অবস্থা হইতে বিকাশের পথে, অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নতির পথে, অস্ফূর্ত্তি হইতে স্ফূর্ত্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। অগ্রগতির পথে চলিতে প্রত্যেকটি বস্তু স্বভাবের অন্তর্নিহিত নিয়মানুযায়ী তদ্বিরোধী বস্তুতে পরিণত হইয়া বিরোধাতিক্রান্ত উন্নততর বস্তুতে সমন্বিত হইতেছে। সেই সমন্বয় আবার ক্রমোন্নতির প্রেরণায় আত্মবিরোধী বস্তুতে পরিণত হইয়া বিরোধাতীত উন্নততর সমন্বয়ে সার্থকতা লাভ করিতেছে। এই ক্রম অনুসারে বস্তুজগতে ও ভাবজগতে বিবর্তন চলিতেছে। এই বিবর্তনের ভিতর দিয়া পূর্ব্বস্তরে যাহা অবিকশিত ছিল পরবর্ত্তীস্তরে বিকশিত হইতেছে, নিম্নস্তরে যাহা আদর্শ ছিল উর্দ্ধস্তরে তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইতেছে। এই বিবর্তনের প্রেরণার শেষ নাই, পরমাত্মার আত্মোপলব্ধিই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। বিরোধসৃষ্টি, বিরোধাতিক্রান্ত সমন্বয়সাধন—এই বিবর্তনের নিয়ম। এই নিয়ম বিশ্বের বস্তুনিচয়কে চালিত করিয়া অপ্রাণকে প্রাণের রাজ্যে প্রাণীকে আত্মার রাজ্যে উন্নীত করিতেছে। এই বিবর্তনের ফলে পরমাত্মা আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই আত্মোপলব্ধিই বিশ্ববিবর্তনের চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে পরমসত্তা একদিকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া অপর দিকে মানবচেতনার ভাবলোকের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সুসংবদ্ধক্রম—যাহাকে আমরা ইতিহাস বলি—পরমসত্তারই আত্মপ্রকাশ। অপর দিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য যে মানব চেতনার প্রকাশবাদ তাহাতেও পরমাত্মা অভিব্যক্ত। বিশ্বের পরমসত্তা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও মানব চেতনা এতদুভয়ের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। পরম সত্তা সর্ব্বত্রই বিরোধসৃষ্টি ও বিরোধাতিক্রম এই নিয়মানুযায়ী প্রকাশমান। সেইহেতু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও মানবচেতনার ভাবধারাতে বিরোধপ্রকাশ ও বিরোধাতিক্রান্ত সমন্বয়-সৃষ্টি দৃষ্টমান হয়। মানবচিন্তার ইতিহাসের প্রারম্ভেই দেখা যায় ইলিয়াটিক দার্শনিকদের নিশ্চল সত্তা হেরাক্লাইটাসের চঞ্চল সত্তাতে বিরোধপ্রাপ্ত হইয়া ডিমোক্রাইটাসের পরমাণুবাদে সমন্বিত হইয়াছে। এই ক্রমানুসারে চিন্তা-জগৎ বিকশিত হইতেছে। অপর দিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও বিরোধসৃষ্টি ও বিরোধাতিক্রান্ত সমন্বয় দ্বারা এই ক্রম অনুসরণ করিতেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ শ্রেণীবিরোধী শ্রমিক সমাজ সৃষ্টি করিয়া সাম্যবাদের মধ্যে সমন্বিত। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং মানবীয় চিন্তাধারা এই উভয় দিকেই পরমাত্মা আপনাকে বিকশিত করিয়া আত্মোপলব্ধি করিতেছে। সমগ্র বিশ্ব পরমাত্মারই প্রকাশ—বাহ্যপ্রকৃতি আত্মারই প্রচ্ছন্নরূপ।

বিজ্ঞানবাদ, আভাসবাদ ও অধ্যাত্মবাদ এই তিন প্রকার ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে বিজ্ঞানবাদমতে বস্তুর সত্তা ব্যক্তিজ্ঞান-সাপেক্ষ, আভাসবাদ মতে বস্তুর আভাস বা দৃশ্যমানসত্তা বিশ্বজনীনমনের জ্ঞান-সাপেক্ষ, বিশ্বে কিছুই ব্যক্তিমনের জ্ঞানসাপেক্ষ নহে; অধ্যাত্মবাদ মতে দৃশ্যবস্তু ও তত্ত্ববস্তু এতদুভয়ই বিশ্বজনীনমনের জ্ঞানসাপেক্ষ এবং এই বিশ্বজনীনমনই পরমাত্মা, জগতের মূল সত্তা। প্রত্যেকশ্রেণীর ভাববাদী একবাক্যে স্বীকার করে যে বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানসাপেক্ষ—কিন্তু ব্যক্তিমনের কি বিশ্বজনীন মনের জ্ঞানসাপেক্ষ এই নিয়া ভাববাদী সম্প্রদায়দের মধ্যে মতানৈক্য।

চিরন্তনী

শ্রীসরোজরঞ্জন চক্রবর্ত্তী—তৃতীয় বর্ষ, বাণিজ্য

এক, দুই, তিন.....। প্রচণ্ডশব্দে মিলিটারী লরি বেরিয়ে গেল। প্রচণ্ড পীচের রাস্তা। দুইধারে সুউচ্চ শালবৃক্ষের সারি,—তারি মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে ইংরাজের যুদ্ধদানব। রক্তমুখো সাহেবগুলো প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও খালি গায়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। অদূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি তাঁবু দেখা যাচ্ছে। কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া বিরাট সীমানা। আশে পাশে সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিলিটারী পাহারা। রাস্তার ধারে কতকগুলি কুকুর একটি ডাষ্টবিনের সামনে ঘেউ ঘেউ করছে অনবরত। অসহ্য গরম। গায়ে প্রায় ফোস্কা পড়ে যায়; তবু সমস্ত জায়গাটা ঘিরে একটা বিরাট কর্ম্মচাঞ্চল্যের ভাব।

যুদ্ধ লেগেছে সাদা চামড়ার দেশে। কিন্তু তার ধাক্কা পোয়াতে হবে কালা আদমীদের—তাদের সংসার সমাজ সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যুদ্ধের আগুনে।

রাঙ্গাপাহাড় থেকে মণিপুর সীমান্ত পর্য্যন্ত নূতন রাস্তা তৈরী হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে সবুজ ধানের ক্ষেতে আঘাতের পর আঘাত পড়ছে কোদালের। দুইধারে চতুষ্কোণ পরিমিত গর্ত্ত খুরে মাটি তোলা হচ্ছে ক্রমাগত।

দলে দলে স্ত্রীপুরুষ অক্লান্তভাবে কোদালের পর কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে। যে যত বেশী মাটি কাটতে পারবে মজুরী তার তত বেশী। মাঝে মাঝে ঠিকাদারের দল ব্যস্তভাবে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে; কাজের নমুনা বুঝিয়ে দিচ্ছে, কাউকে ধমক দিচ্ছে, কাউকে গাল দিচ্ছে। তার প্রচণ্ড ক্ষমতা এখানে, বলতে গেলে তাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা তো সেইই।

মাটী কাটতে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্দ্ধমান অঞ্চলের অধিবাসী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অনিবার্য্যতায় যারা বাহিরকে করেছে ঘর তাদের জড়ো করে নিয়ে এসেছে চতুর ইয়াসিন মিঞা। ভাল খাওয়া পাবে, টাকাও যখন পাবে প্রচুর, তবে হউক না কিছুটা ম্যালেরিয়ার আড্ডা। বড় সুবিধা দরে লোকগুলিকে পেয়েছে ইয়াসিন মিঞা। কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ক্রুর হাসি হাসে সে।

সনাতন মোড়ল প্রথমটায় গ্রাম ছেড়ে অত দূরে আসতে রাজি হয়নি। কিন্তু গ্রামে বসে থেকেই বা খাবে কি? সারা গাঁয়ে অলক্ষ্মী ভর করেছে। রুজিরোজগার বন্ধ। চাল ডাল দুষ্প্রাপ্য ও অগ্নিমূল্য। তার উপর কামাতুর জমিদার নন্দনের অত্যাচার। ঘরে তার ডাগর বৌ গোলাপী। গরীবের ঘরের মেয়ে হলেও অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ও যৌবন প্রাচুর্য্যের অধিকারিনী সে। তার দিকে নজর পড়েছে মোহিতবাবুর। উপোসে না হয় থাকা যায় কিন্তু মেয়ে মানুষের বেইজ্জতি সহ্য করতে পারবে না সনাতন। নাঃ সে চলেই যাবে! পোঁড়া গাঁয়ে আর থাকবে না। অভিমানে ক্ষোভে বৌয়ের হাত ধরে ইয়াসিন মিঞার দলে ভিড়ে যায়।

মরা ডোবাটার ধার দিয়ে যেখানটায় রাস্তাটা বেঁকিয়ে সোজা বেড়িয়ে গেছে, তারই অনতিদূরে বাঁশের মাচার উপর নির্ম্মাণ হয়েছে সারি সারি বস্তী। যারা স্ত্রীপুত্র নিয়ে এসেছে তাদের একধারে, আর খালি মরদ যারা তাদের অন্যধারে থাকবার, বন্দোবস্ত হ'য়েছে। দুটি ছোট্ট ঘর নিয়ে দিব্যি সংসার পেতেছে সনাতন। সকালে নুনপান্তা খেয়ে কোদালটা ও ঝুড়িটা নিয়ে কাজে বেড়িয়ে যায়, আর একলা দরজা আটকে ঘরের কাজকর্ম্ম করে গোলাপী। তারপর কিছুটা বেলা হয়ে গেলে, একটা জলের কুঁজা নিয়ে নিজেও বেড়িয়ে যায় কাজে—সনাতনের সাথে জোগাল দেবার জন্য।

বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছে তাদের দিনগুলি। গোলাপী

INTER-COLLEGIATE REGATTA CHAMPION
(DAY)
1948

Sitting (from left)—Prof. P. Roy (Games-in-Charge), Prof. S. Bhattacharyya, Principal Someswar Mukherji, A. Sinha (Games Secretary).
Standing (from left)—S. Chakravarty (Captain), J. Singh, S. Dutta, A. Kundu, Debaprasad Barua, S. Ganapati (Reserve).

COUNCIL OF THE STUDENTS' UNION
(DAY DEPARTMENT)
1947-48

Sitting (from left)—Kanu Banerjee (Assistant Games Secretary), Arun Sinha (Games Secretary), Pranab Ghosh (Acting Secretary), Principal Someswar Prasad Mukherji, Prof. Sibnath Chakravorty (President), Akhil Roy (Propaganda Secretary), Ajit Sen (Vice-President), Dijen Guha Baksi, Bisheswar Das Gupta.

Standing (from left)—Prasanta Sen (Poorfund Secretary), Amiya Ray, Arun Banerjee (Cultural Secretary), Bamandas Mukherji (Debating Secretary), Bireswar Banerjee (Magazine Secretary), Asit Dey (Common Room Secretary), Arabindo Guha Thakur, Sasanka Sen.

সারে না—রোগীটি মরে যায় একদিন আচম্বিতে। মৃত সন্তানের পাশে বসে অনর্গল প্রবোধ দিয়ে যায় ডাক্তারবাবু।

পাড়ার লোকে বলে সনাতনের জন্য অনেক করেছে করালী ডাক্তার।

সব কিছুই হয়ত ক্রমে ক্রমে সয়ে যেত গোলাপীর। কিন্তু বিপদ কখনো একা আসে না! একদিন দুপুরে বস্তীর কতকগুলি লোক ধরাধরি করে নিয়ে এল সনাতনের রক্তমাখা দেহটাকে। পা দুটো থেঁতলে গিয়েছে তার। কপালের ধার দিয়ে অনেকটা কেটে গেছে। একটা হাতও প্রায় অসাড় হয়ে পড়েছে। ঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে আসে গোলাপী। তার পায়ের কাছ থেকে সমস্ত পৃথিবীটা যেন সরে যাচ্ছে। গাড়ী চাপা পড়েছে সনাতন। তবে ভয় নেই, বেঁচে যাবে।

স্বামীর অচেতন দেহটাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে উঠে গোলাপী। অনেক চেষ্টা করা হল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অসাড় হয়ে গেছে পাদুটো। ডান হাতখানা তো কেটে বাদই দিতে হল। গোলাপীর বুক ছাপিয়ে কান্না নেমে আসে! অমন সুন্দর মরদটা কি রকম কুৎসিৎ হয়ে গেছে। কোনরকমে নড়ে চড়ে বসতে পারে, দাঁড়াতে পারে, কিন্তু হাঁটতে পারে না সনাতন। ঘরের মাচাটির একটি কোণ দখল করে সর্বদা কাঁথাকম্বল নিয়ে চুপ করে বসে থাকে সে। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে তার। এই অচল জড়, অথর্ব, হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি? সবচেয়ে দুঃখ হয় তার গোলাপীর জন্য। জীবনের অনেক কামনাই তার পূরণ হয় নি। কত মুকলিত আশা আকাঙ্ক্ষা কূল ছাপিয়ে ভেসে উঠেছিল তার মনে! দুতিনটে ছেলেমেয়ে……তারপর বৃদ্ধ বয়সে স্বামীর হাত ধরে কাশী বিশ্বনাথের চরণতল। আঃ কত মধুর সে স্মৃতি। সব শেষ হয়ে গেল। বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে সনাতনের।

গোলাপী কিন্তু কোনদিনই অশ্রদ্ধা করে নি তার স্বামীকে। সযত্নে সেবা করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। হউক না তার স্বামী একটি জড়পদার্থ। তবুও তো তার স্বামী।

একদিন সনাতন বলে, বউ তোর জন্য ভারী দুঃখ হয় আমার! তুই বরং কোথাও চলে যা। শিউরে ওঠে গোলাপী। এ কথা ভাবাও যে মহাপাপ।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্লান্তভাবে কাজ করে যায় গোলাপী। অত্যধিক পরিশ্রমে তার শরীর বেশ ভেংগে পড়েছে। আগেকার সেই প্রাণপ্রাচুর্য্য যেন আর নেই। সেই চাপাচাপা হাসি, সেই অভিমানভরা চোখের দৃষ্টি, সেই অকারণ প্রগলভতা, সব যেন কার যাদুমন্ত্রে স্তব্ধ হয়ে গেছে! কলের পুতুলের মত উদয়াস্ত খেটে যায়; আশা নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধু অপরিসীম কর্তব্য। আর কিছু নয়।

সপ্তাহ শেষে টাকাগুলি এনে স্বামীর হাতে দেয় গোলাপী। বেশ সেজেগুজে পান চিবুতে চিবুতে কাছে এসে বসে, আর অনর্গল কথা বলে যায়। ভুনুরের মা'র কথা, উদাসীর স্বামীর কথা, সুখন সর্দারের কথা।

শুধু একটি কথা বলতে বলতেও থেমে যায় গোলাপী। মন বিষিয়ে উঠে তার। পর মুহূর্তেই সনাতনের মুখের দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে অকারণে। তাকে যে হাসতেই হবে। নইলে সনাতন যে মরে যাবে।

ভারী চমৎকার মানিয়েছে গোলাপীকে আজ। আদর করতে ইচ্ছে করে সনাতনের। ভেসে ওঠে অতীত দিনের কত মধুর স্মৃতি। আর আজ? নিজের চরম অক্ষমতা চাবুক মেরে স্মরণ করিয়ে দেয় অনিবার্য্য বর্তমানকে। অসহ্য বেদনায় গুমরাতে থাকে সনাতন।

পরিপূর্ণ যৌবনের এই অতৃপ্ত বেদনা মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু করে তোলে গোলাপীকেও। নিজের দেহটার পানে চেয়ে দুরন্ত অভিমানে গজরাতে থাকে তার অন্তরাত্মা।

সনাতনের নিরানন্দ জীবনকে রূপ রস আনন্দে ভরে দেবার জন্য গোলাপীর যে ছলাকলার প্রয়োজন হয়েছিল, সেই কৃত্রিম অভিনয়ই তার কাল হ'ল। স্বামী যার চিরপঙ্গু, ভবিষ্যৎ যার শুধু অন্ধকারভরা, তারই মনে হঠাৎ কেন জেগে উঠল উচ্ছল আনন্দের বন্যা, কোন

সম্ভাবনায় তার মুখে ফুটে উঠল আবার প্রাণমাতানো হাসি, এই চিন্তা সন্দিগ্ধ করে তোলে সনাতনকে। সে কিছুতেই ভেবে পায় না, তার এই উচ্ছসিত জীবনের মূল উৎস কোথায়? মনে মনে অনেক বিসদৃশ কল্পনার রেখা এঁকে যায় সনাতন। সেদিন কাজ থেকে ফিরে আসবার পথে এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে আসে গোলাপী। গরম গরম তেলেভাজা খাবার সখ সনাতনের অনেকদিন থেকে।

খাবার ঠোঙ্গাটা এগিয়ে ধরতেই গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে সনাতন একটা সত্যি কথা বলবি গোলাপী?

হাত থেকে ঠোঙ্গাটা পড়ে যায় মাটিতে। অজানা আশংকায় মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে যায় তার।

সারাদিন তুই কি শুধু মাটি কাটার কাজই করিস, —না আর কিছু? এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারে গোলাপী। দারুণ ঘৃণায় বেশ চড়া মেজাজেই জবাব দেয়,—নাঃ শুধু মাটী কাটবো কেন? কথার রকম দেখ না! আমার রোজগার খাবে, আবার আমারই নামে বদনাম দেবে! মুখে আগুন! জড় অফম, অথর্ব হলেও স্বামীত্বের উপর অতবড় আঘাত সহ্য করতে পারে না সনাতন। চিৎকার করে বলে উঠে, কি বললি আমার মুখে আগুন? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা—বলে যেই উঠে দাঁড়াতে যাবে, অমনি অসহ্য বেদনায় চিৎ হয়ে লুটিয়ে পড়ে সনাতন। পা দুটো যন্ত্রণায় টন্‌টন্ করে উঠে। নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে থাকে সনাতন।

গোলাপী আর কথা বাড়ায় না। অনুকম্পার বেদনায় দুচোখ ভরে তার জলের ধারা নেমে আসে। সত্যিই তার মেজাজটি দিনদিনই যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে। এ রকম খিটখিটে মেজাজ আগে তো' তার ছিল না। কি যেন হয়েছে তার। অতটা আঘাত দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি সনাতনের মনে। মনের কোণে ভেসে উঠে তার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পাঁচালীর দুটো লাইন :—

পতিরে অবহেলা করে যেইজন
ইহলোকে দুঃখ পায় নরকে গমন।

ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে সনাতনকে, মৃদুকণ্ঠে বলে—ছিঃ ছিঃ তুমি আমার দেবতা, গুরুজন তোমাকে ছাড়া আর কারো চিন্তা যে মহাপাপ। নাও খাবে এস।

তখনকার মত শান্ত হয় সনাতন। কিন্তু কিছুতেই সে মনকে প্রবোধ দিতে পাচ্ছে না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। তার মনে ক্রমশঃই নানা আজগুবী চিন্তা মনের মধ্যে বাসা বাঁধে সনাতনের। মনে পড়ে ডাক্তারের কথা। তার সাথে গোলাপীকে জড়িয়ে যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে সে। নাঃ আজই তাকে সে মানা করবে কাজে যাবার জন্য। উপোষ থাকবে? ওতি আচ্ছা! তবু.....আর ভাবতে পারে না সনাতন। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে তার।

সেদিন বেশ একটু রাত্রি করে ঘরে আসে গোলাপী। নিটোল ঠোঁটটি বেয়ে তখনও পানের রস ছাপিয়ে পড়ছে তার চিবুক বেয়ে। সনাতনের বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ী মারে। বেশ দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? জবাব দেয় না গোলাপী। আবার প্রশ্ন করে সনাতন, কি চুপ করে আছিস যে, ভাবছিস লুকিয়ে লুকিয়ে জল খাবি, শিবের বাবাও টের পাবে না! না? আমার চোখে ধুলো—

কথাটা শেষ করতে পারে না সনাতন। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয় গোলাপী, ছিঃ কি যাতে বকছো? লোকে শুনতে পেলে কি বলবে বলতো? —বলেই কথাটা ঘুরিয়ে দেয় গোলাপী, এই নাও তোমার জন্য এই নূতন কাপড়খানা এনেছি। পছন্দ হয়েছে তো? আর এই ধর দশটা টাকা।

টাকা! একটা নয়, দুটো নয়; একেবারে দশ দশটা টাকা! জলজ্যান্ত নোটটা হাতে নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সনাতন। মুহূর্তে তার মুখে ফুটে উঠে এক অদ্ভুত হাসি। ভুলে যায় জিজ্ঞেস করতে এই টাকার উৎস কোথায়। সত্যিই গোলাপী বড় ভাল মেয়ে।

গোলাপীর জন্য বদটা যেন হঠাৎ উথলে উঠেছে

সনাতনের। হঠাৎ গোলাপী একদিন আবিষ্কার করে একটি খালি মদের বোতল সনাতনের ভাঙ্গা মাচার কোণ থেকে। শিউরে ওঠে গোলাপী। সনাতন মদ ধরেছে।

একদিন রাত্রে সনাতন দুটো টাকা চায় গোলাপীর কাছে। টাকার প্রয়োজন বুঝতে দেরী হয় না গোলাপীর। গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, "টাকা কোথায় পাব?"

বিকৃত হাসিতে বলে উঠে সনাতন—ইস্! তোর আবার টাকার অভাব! কথাটা খট করে কানে এসে বেধে গোলাপীর। তবে কি স্বামী তার, মেনে নিয়েছে কল্পিত রোজগারের উৎসটিকে। দুঃখে বেদনায় কেঁদে ফেলে গোলাপী।

ডাক্তারবাবু আজকাল বড় ঘনঘন যাতায়াত করছেন সনাতনের কাছে। মদের টাকার গৌরীসেনটিকে চিনতে দেরী হয় না গোলাপীর।

অতিরিক্ত খাটুনীতে শরীরটা গোলাপীর সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। কদিন অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে তার। তার উপর নানাচিন্তায় তার মেজাজটি ভাল নেই, বিছানায় শুয়ে আছে। সনাতনের ডাক শুনে উঠে আসে।

গোলাপী কাছে আসতেই সনাতন বলে, দেখ বৌ! ডাক্তারবাবু লোকটি বুঝলি খুব ভাল লোক। একেবারে দিলদরাজ। অথচ তুই তাকে দেখতেই পারিস না। সেদিন কত দুঃখ করেছিল এই জন্য। এই দেখনা তোর পরণে ছেঁড়া কাপড় দেখে এই জংলী সাড়ীখানা পাঠিয়ে দিয়েছে,—বলেই বালিসের তলা থেকে সাড়ীখানা বের করে দেখায়। এতক্ষণে ডাক্তারবাবুর অযাচিত অনুগ্রহের কারণটি খুঁজে পায় গোলাপী। দারুণ ঘৃণায় তার চোখ দুটি জ্বলতে থাকে। সনাতনের হাত থেকে সাড়ীটি ছিনিয়ে নিয়ে প্রবল বেগে ছুড়ে ফেলে মাটিতে। স্বামী তাকে পণ্যের মত বিক্রী করতে চাচ্ছে। অপমানে, লজ্জায় সে প্রায় কেঁদে ফেলে।

কিন্তু সনাতন দমবার পাত্র নয়। বীভৎস হাসিতে আবার বলতে সুরু করে,—আঃ কি যে করিস বৌ, টাকাওয়ালা লোক, দিচ্ছে নিজে থেকে সাড়ীখানা, নে না। তোর সবটাতেই ইয়ে, বলি আমি নেইনি তোর রোজগারের টাকা।

গোলাপী আর শুনতে পারে না। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে। কত অধঃপাতে নেমে গেছে সনাতন ভাবতে পারেনি। ছুটে পালিয়ে যায় সনাতনের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে ঝাপটা বন্ধ করে বেদনায় লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। চোখ দিয়ে তার জলের ধারা ক্রমাগত বেয়েই চলেছে।

* * *

রাত্রি তখন প্রায় বারটা বেজে গেছে বোধ হয়। সমস্ত রাস্তাটা নির্জন হয়ে গেছে। সুরবালার দুরন্ত ছেলেটাও একটানা অনেক কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কিছুটা চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে ঘরের ভিতর। কিন্তু অন্ধকার তাতে তেমন কাটেনি। চারিদিক নিঝুম, শুধু খালের ধারে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে একটানা।

একটা আঁচমকা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় গোলাপীর, অবিন্যস্ত কাপড়টাকে সামলে নিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে। অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না গোলাপী। কিন্তু আবার একটা শব্দ। নাঃ আর তো ভুল করা চলে না। হঠাৎ গোলাপী অনুভব করে একটা লোক যেন ঝাপ খুলে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পায় গোলাপী। বালিশের তলা থেকে হাতড়ে হাতড়ে বের করে নেকড়া জড়ানো দেশলাইটিকে। মাচার তলা থেকে মাটীর প্রদীপটি এনে বাতি জ্বালাতেই যে অভাবনীয় দৃশ্যটি তার চোখে পড়ে, তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না গোলাপী।

.....টলতে টলতে এগিয়ে আসছে করালী ডাক্তার। হাতে তার সেই সাড়ীটা। চোখে মত্ততার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

আর সেই ঘরেরই ঝাপটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে তারই পতিদেবতা সনাতন মোড়ল। মুখে তার এক বীভৎস হাসি। বাঁ হাতে তার একতাড়া নোট স্বল্প আলোকেও ঝলমল্ করছে।.....

দেশীয় ভাষায় টেলিগ্রাম

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ইংরেজী ভাষার প্রতি আমাদের আক্রোশ নেই। ইংরেজী শেখার প্রয়োজন আজও আছে পরেও থাকবে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজীর অপ্রতিহত অধিকার। কিন্তু মাতৃভাষার স্থান অধিকার করে থাকবে অন্য কোনো বিদেশী ভাষা, আপত্তি শুধু এইখানেই। দেশের আপামর জনসাধারণকে ইংরেজী শিখতেই হবে এমন কোনো মানে নেই। সুখের বিষয়, স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি পড়েছে। প্রাদেশিক সকল সরকারই প্রদেশের সরকারী কাজ কিছু কিছু প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে দিয়ে চালাতে শুরু করেছেন। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে চলছে। এখন উচ্চতন শিক্ষার ক্ষেত্রেও যাতে মাতৃভাষাকে বাহন করা যায় তার চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারও উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজীর বদলে ভারতীয় কোনো ভাষা গ্রহণ করা উচিত বলে মেনে নিয়েছেন।

আমার দেশের ভাষা আমার পক্ষে যত সহজে শেখা সম্ভব এবং সে ভাষায় যত সহজে ভাব প্রকাশ করা সম্ভব এমন কি বিদেশী ভাষায় কখনো হতে পারে? এতদিন সে কথা ভাল করে বুঝি নি, হয়তো বুঝলেও কাজে লাগাতে পারি নি। আজ সহজে বুঝছি। মাতৃভাষাকে সর্বত্র স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনাও আজ উপস্থিত হয়েছে। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে দিয়ে যে টেলিগ্রাম আদান-প্রদান করা চলে, একথা আগে কেউ ভেবেছে কি? কিন্তু প্রস্তাবটা উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু উৎসাহ দেখা গেল। সে উৎসাহের বেগ একদিন ভারতসরকারের দরজায় গিয়ে আঘাত করবে এমন আশা করা যায়। অন্ততঃ সে আশাকে দুরাশা বলে মনে করব না।

এই প্রবন্ধ লিখতে লিখতে একটা সংবাদ চোখে পড়ল—আজকের কাগজের (১১. ৭. ৪৮) সংবাদ—পাকিস্থান সরকার উর্দু ভাষায় টেলিগ্রাফি প্রবর্তনের উদ্যোগ করছেন। উর্দু লিপির রোমান রূপ স্থিরীকৃত হলেই এ কাজ তাঁরা আরম্ভ করবেন। কারণ, রোমান হরফের উপরেই টেলিগ্রাফির সংকেতাবলীর প্রতিষ্ঠা।

আমরা হিন্দুস্থানের জন্যে উর্দু লিপির অর্থাৎ ফারসী-আরবীর শরণাপন্ন হব না। আমাদের বর্ণমালা আছে। তার চেয়ে বৈজ্ঞানিক সুবিন্যস্ত এবং সুপরিকল্পিত বর্ণমালা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। এই অকারাদি হকারান্ত বর্ণমালা ভারতীয় মনীষার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এই বর্ণমালার ব্যবহার। কুমারিকা থেকে হিমালয় এবং পাঞ্জাব থেকে আসাম পর্যন্ত, যেখানেই যাই না কেন, এই অ আ ক খ-র ব্যবহার। তবে লিপির চেহারাটা সর্বত্র এক নয়। তা নাই হল, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, আগেই বলেছি, মর্সের সংকেতের ভিত্তি হল রোমান হরফ A B C D। যে লিপিতেই সংবাদ রচিত হোক না কেন, তাকে রোমানে রূপান্তরিত করতেই হবে। —তা সে সংবাদ প্রেরক নিজেই করুন অথবা টেলিগ্রাফ আপিস থেকেই করা হোক।

হিন্দুস্থানের পক্ষে তার বর্ণমালা এক মস্ত সুবিধা। এই বর্ণমালার রোমান রূপও মোটামুটি স্থির হয়েই আছে। বহু পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থ এই রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছে। ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘকাল ধরে এই হরফ ব্যবহার করছেন। পণ্ডিতেরা এই আর্য বর্ণমালার রোমান রূপের একটা নাম দিয়েছেন—ভারত রোমক লিপিমালা।

উপরে বলেছি আর্য বর্ণমালার রোমান রূপ মোটামুটি ঠিক হয়েছে। মোটামুটি বলছি এইজন্যে যে দু-একটি চিহ্নের মধ্যে কিছু ইতরবিশেষ দেখা যায়। তবে সে অতি সামান্য। ইংরাজী যে হরফের প্রচলিত উচ্চারণের

দেশীয় ভাষায় টেলিগ্রাম

সঙ্গে আমাদের যে দেশী হরফের উচ্চারণ মেলে সেই হরফই তার প্রতীক বলে গণ্য হয়। যেমন, অ=A, ই=I, উ=U, এ=E, ক=K, গ=G, জ=J, প=P, ব=B ঘ=GH, ঝ=JH, ফ=PH। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকটি রোমান বর্ণকে কয়েকটি দেশী বর্ণের প্রতীক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। যেমন, চ=C, ছ=CH, ত=T, থ=TH, দ=D, ধ=DH। এতেও যখন সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হল না তখন কয়েকটি চিহ্নের আশ্রয় নেওয়া হল। ইংরাজী বর্ণের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন যোগ করে ভারতীয় বর্ণের ইংরাজী অর্থাৎ রোমান রূপ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হল।

ইংরাজীতে এগুলিকে বলা হয় diacritical marks; বাঙ্গালায় নাম দেওয়া যাক সূচক চিহ্ন। ৫টি চিহ্নের দ্বারা সাধারণতঃ কাজ চালানো হয়। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাফির প্রবর্তন করতে হলে ঐ চিহ্নের সংখ্যা কমানো দরকার। অনেক ভেবে-চিন্তে সূচক চিহ্নের সংখ্যা কমিয়ে পাঁচ থেকে তিনে নামানো হয়েছে।

চিহ্নগুলি কি রকম তা এই প্রবন্ধে দেখানো যাচ্ছে না; তার কারণ যেখানে এ লেখা ছাপা হচ্ছে সে ছাপাখানায় ঐ টাইপ নেই। আমরা ১, ২ ও ৩ এই তিনটি অঙ্ককে ঐ তিনটি চিহ্নের বদলে বসিয়ে আমাদের বক্তব্যটা বোঝাই।

অ	A	ক	K	ট	T^2	প	P	শ	S^1
আ	A^1	খ	KH	ঠ	T^2H	ফ	PH	ষ	S^2
ই	I	গ	G	ড	D^1	ব	B	স	S
ঈ	I^1	ঘ	GH	ঢ	D^2H	ভ	BH	হ	H
উ	U	ঙ	N	ণ	N^2	ম	M	ং	M^2
ঊ	U^1	চ	C	ত	T	য	Y	ঃ	H^2
ঋ	R^2	ছ	CH	থ	TH	র	R	ঁ	A^3
এ	E	জ	J	দ	D	ল	L		
ঐ	AI	ঝ	JH	ধ	DH	ৱ	V		
ও	O	ঞ	N^3	ন	N				
ঔ	AU								

উপরের তালিকা দেখলে এইটুকু সহজেই বোঝা যাবে যে তিনটি চিহ্নের সাহায্য নিলে রোমান হরফের দ্বারা ভারতীয় বর্ণমালার সকল বর্ণেরই রূপান্তর পাওয়া যাবে। এখানে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই যে উপরে যে ১ ২ ও ৩—এই তিনটি অঙ্কের ব্যবহার করা হয়েছে, লেখার সময় এগুলির ব্যবহার হবে না। তার বদলে তিনটি স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহার হবে

এইবার আসল কথায় আসা যাক। পূর্বেই বলেছি Morse Code বা মর্সের সংকেত রোমান বর্ণমালার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিন্দু (বা টরে) এবং ড্যাশ (বা টক্কা) এই দুইটি চিহ্নের দ্বারা ঐ সংকেতমালা রচিত। এক একটি চিহ্ন স্বতন্ত্রভাবে বা একাধিক চিহ্ন সংযুক্তভাবে এক একটি বর্ণের প্রতীকরূপ নির্দিষ্ট আছে। এই ২৬টি বর্ণের ২৬টি সংকেত সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত হয়েছে। তার ফলে রোমান হরফে টেলিগ্রাফ করার কোনো অসুবিধা হয় না। যে কোনো ভাষার লেখাই হোক না কেন রোমান হরফে লিখলে স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাফ করা চলবে।

ভারতীয় ভাষার পক্ষে একটু অসুবিধা আছে। তিনটি চিহ্নের জন্য তিনটি সংকেত রচনা করা যায়, তাহলে সে অসুবিধাও সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সংকেত রচনা করলেই কাজ হয় না। দেশের লোক যদি প্রয়োজন বোধ না করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি দৃষ্টি না দেন তো পরিকল্পনা শুধু কল্পনাই থেকে যাবে, বাস্তবরূপ পাবে না।

পাঁচমিশালি

তেজেন গুহ রায়

—তৃতীয় বর্ষ, সাহিত্য—

ভদ্রলোকের এক কথা—

একবার কোন এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যান। নানা রকমের প্রশ্নের সাথে সাথে ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে প্রশ্ন করেন—'মেয়ের বয়স কত?'

মেয়ের বাবা উত্তর দেন—'পনেরো।'

কিন্তু কোন কারণে যাই হোক সেই বিয়ে আর হয় না। প্রায় বছর দুই পরে এই ছেলের বাবা তাঁর এক বন্ধুর ছেলের জন্য দৈবক্রমে সেই মেয়েই দেখতে যান। এবারও নানা প্রশ্নের সাথে ভদ্রলোকের বন্ধু মেয়ের বাবাকে জিজ্ঞেস করেন 'মেয়ের বয়স কত হোল?' মেয়ের বাবা জবাব দেন—'পনেরো'।

'সে কি! দুবছর আগেও না বলেছিলেন মেয়ের বয়স পনেরো? এখনও বলছেন পনেরো?' প্রশ্ন করেন সেই ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ মশাই, ভদ্রলোকের এক কথা'—গম্ভীরভাবে জবাব দেন মেয়ের বাবা।

দর্শক অপেক্ষা উদ্যোক্তা বেশী—

এক ছাত্রসঙ্ঘের উদ্যোগে মিলন উৎসবের এক অনুষ্ঠান। যোগদান করতে খুব আগ্রহ সহকারে গেছি। গিয়ে দেখি ছাত্রকর্মীদের মধ্যে প্রায় সকলেই উদ্যোক্তা। ভাবলাম তা হলে অনুষ্ঠানের দর্শক কারা? বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ব্যাপার কতদূর কি গড়ায়। একজন ছাত্রবন্ধু আগে প্রবেশপত্র না পাওয়াতে উদ্যোক্তাদের একজনকে ডেকে ছাত্রসঙ্ঘের কাউকে ডেকে দিতে অনুরোধ করল।

'কেন কি দরকার 'আমাকেই বলুন না' বলে সে কোথায় যে চলে গেল হদিস পেলুম না। তারপর সেই ছাত্রবন্ধুটিও বোধ হয় ভাবল যে সেও এইসব বলে ছাত্র উদ্যোক্তাদের একজন হয়ে যাক না কেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেও প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

এক ভদ্রলোক ঢুকতে যাবেন, তাকে আটকানো হ'লো। সে ভদ্রলোকের বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি একজন আর্টিষ্ট—তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না কেন? কিছুতেই যখন কিছু হয় না, তখন ভদ্রলোক অনেক খুঁজে পকেট থেকে তাঁর আর্টিষ্ট কার্ডখানা বার করলেন। তখন উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ একটু হেসে বললেন 'আগে বলতে হয় যে আপনি আর্টিষ্ট—যান, যান ভেতরে যান'। এই বলে তাকে দর্শকদের ভীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হোল। এইভাবে কিছুক্ষণ পার হবার পর ছাত্র-উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বললেন 'তিনজন আর্টিষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না—কোথায় গেল?' একবার বলার ইচ্ছে ছিল যে তাঁরা দর্শকদের ভীরের মধ্যে হারিয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বাইরের থেকে আর একজন এসে বললেন 'অন্যান্য আর্টিষ্টরা এসে গেছেন, কোথা দিয়ে নিয়ে যাই?'

নিয়ে যাবার কোন রাস্তা ছিল না কারণ ছাত্র-উদ্যোক্তাদের সুব্যবস্থায় এবং স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অদম্য চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অবশেষে তাঁদের ভীরেই দরজা সব কটা বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক তারপর কোন রকমে আর্টিষ্টদের ভেতরে নেওয়া হ'ল। এক সময় দেখলাম যে অধ্যাপকবৃন্দকে সমাদর করে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য এমন সুব্যবস্থা ছিল যে কয়েকজন অধ্যাপক মহাশয়কে নিজেদেরই পথ করে ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে। এইভাবে আরও অনেক ঘটনার পর (বা বলার ইচ্ছে নেই—বলা চলেও না) কোন রকমে যখন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম,—দেখলাম যে দর্শক নেই—উদ্যোক্তাই সব।

প্রেস না ডিসপেন্সারী?—

একবার এক প্রেসে একটা বই ছাপাতে দিয়েছিলাম। যখনই বইএর তাগাদায় প্রেসে যেতাম তখনই প্রেসের মালিক আমাকে জিজ্ঞেস করতেন 'ভাল আছেন ত?' 'শরীর এখন কেমন যাচ্ছে?' 'আপনার শরীরটা এত খারাপ হো'ল কেন?' ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ভাবতাম

যে এটা প্রেস না ডিসপেন্সারী? তারপর যখন জিজ্ঞেস করতাম—'কতদূর কাজ এগুলো?'

তখন বলতেন—'এই ত প্রায় শেষ হয়ে গেছে।' যাই হোক তারপর দীর্ঘ ছমাস পরে সেই বই ছেপে বেরোয়। ভাবছি এবার থেকে কোন কিছু ছাপতে হলে ডিসপেন্সারীতে না গিয়ে প্রেসেই যাব।

আই, এতে ভূগোল ছিল না—

এক ভদ্রলোক 'আই, এ পাশ কর্মচারী চাই' বিজ্ঞাপন দেখে এক আফিসে চাকুরীর আশায় গেছেন।

আফিসের বড়বাবু, নাম, বয়স ইত্যাদি জেনে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার দেশ কোথায়?' ভদ্রলোক তাঁর গ্রামের নাম বললেন।

বড়বাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—'কোন জেলায় বলুন ত?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন—'দেখুন আমার আই, এতে ভূগোল ছিল না। তাই ভূগোল সম্বন্ধে আমার খুব বেশী ধারণা নেই।'

কলেজ ও আমরা—

কলেজের কমনরুমে বসে আছি। আমার পাশে বসে একজন ছাত্রবন্ধু একখানা 'সচিত্রভারত' খুব মন দিয়ে পড়ছেন। কিছুক্ষণ পরে ঘণ্টা বেজে উঠল। ছাত্রবন্ধুটি গম্ভীরভাবে পত্রিকাখানা পকেটে পুরে ক্লাসের দিকে রওনা হতে যাবেন—এমন সময় আমি জিজ্ঞেস করলুম—'পত্রিকাটা কোথায় নিয়ে চল্লেন?'

'আরে দাদা এসব কি আর এইটুকু সময়ের মধ্যে পড়া হয়? একটা খুব ভাল গল্প পড়ছিলুম; এখনও শেষ হয় নি। বাড়ী নিয়ে গিয়ে ভাল করে পড়ে কালকে কিংবা পরশু ফেরৎ দেব।' কথাটা শেষ করে তাড়াতাড়ি ক্লাসের দিকে চলে গেলেন।

আর একদিন দেখি ক্যারাম খেলতে খেলতে ঘণ্টা বেজে ওঠায় সেদিন আর এক ছাত্রবন্ধু ক্যারামের ষ্ট্রাইকারটা পকেটে পুরে চলে গেলেন—বোধ হয় পরের ঘণ্টায় ছুটি আছে।

একদিন এক ছাত্রবন্ধু একখানা খবরের কাগজ খুব মন দিয়ে পড়ছেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি তিনি সেই কাগজখানা রেখে সমস্ত কমনরুমে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ভাবলাম বোধ হয় কিছু হারিয়ে গেছে, হঠাৎ মনে পড়েছে তাই বোধ হয় খুঁজছেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন—'আরে না মশাই কিছুই হারায় নি। একটা খবরের কাগজের একখানা পাতায় একটা খবর পড়ছিলুম। তার বাকী অংশটুকু আর একখানা পাতায়; সেই পাতাটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই ভীরের মধ্যে কোথায় খুঁজে পাই বলুন ত?'

তখন ব্যাপারটা বুঝলাম।

একদিন ক্লাসে বসে আছি। দেখি আমার পাশে বসে এক ছাত্রবন্ধু একটা ছুরি দিয়ে বেঞ্চির ওপরে খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর নাম খোদাই করছেন।

বললাম—'বেঞ্চিটাকে এইভাবে নষ্ট করছেন কেন?'

'আরে মশাই, আমার কলেজের বেঞ্চিই ত নষ্ট করছি; আর কোন কলেজের বেঞ্চিত আর নষ্ট করছি না' বলে তিনি আবার তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন। কি আর করব? চুপচাপ বসে রইলাম।

একদিন কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখি একজন ছাত্রবন্ধু তাঁর চটিটা চটাস্ চটাস্ করে এক অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ওপরে উঠছেন। আর একদিন দেখলাম যে আর একজন ছাত্রবন্ধু আপনমনে শীষ দিতে দিতে পায়চারী করছেন।

কমনরুমে গিয়ে একখানা বইএর নাম করাতে জবাব এল 'বইখানা আর কদিন পরে নেবেন।'

প্রশ্ন করলাম—'কেন?'

উত্তর এল—'আপনাদেরই কোন এক ছাত্রবন্ধু বইখানা নিয়ে এমন অবস্থায় ফেরৎ দিয়েছেন যে বইখানা বাঁধাতে দিতে হয়েছে।'

লাইব্রেরীতে একদিন গিয়ে একখানা বই চাইতে অনেক কষ্টে ভদ্রলোক জবাব দিলেন 'এই বই বাড়ীতে নিয়ে যাবার নিয়ম নেই।' যাই হোক তারপর Sayers এর Modern Bankingখানা দিতে বললাম। জবাব এল 'বইখানা অনেকদিন হোল একজন নিয়ে গেছেন—এখনও ফেরৎ দেওয়া দরকার মনে করেন নি।' অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

আমরা স্কুল ও কলেজে আসি বিদ্যাশিক্ষা করতে, আর বিদ্যাশিক্ষা মানে কয়েকখানা বই পড়া নয়—তার সাথে সাথে থাকা চাই ভদ্রতা, নম্রতা এবং রুচিবোধ।

বই নিলেই এমনভাবে ফেরৎ দিতে হবে যে সে বই বাঁধাতে দিতে হয়, কলেজের নিয়ম অনুসারে ঠিক সময়মত বই ফেরৎ দিতে ইচ্ছেই করে না, পড়তে পড়তে বই নিয়ে বাড়ী চলে যাওয়া, পরের ঘণ্টায় খেলবার জন্য ষ্ট্রাইকার নিয়ে ক্লাসে যাওয়া, বেঞ্চিতে কিংবা দেয়ালে

নিজেদের নাম খোদাই করা, অভদ্রোচিত ব্যবহার ও চলাফেরা করা, শীষ দেওয়া, ঘণ্টা শেষ হলে চিৎকার করে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়া ইত্যাদি আরও বহু প্রকারের নোংরা এবং অমার্জনীয় এই সমস্ত বদ অভ্যাসগুলো কি কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না? আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে এই সমস্ত কাজে কলেজের কিছুই এসে যায় না ; ফলভোগ করতে হয় আমাদের নিজেদেরই। আমরা যদি আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়দের এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের প্রতি সম্মান দেখাতে না পারি, তাতে আমাদেরই লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

সমস্ত ছাত্রসমাজের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে অতীতের সমস্ত কলঙ্কময় দৃষ্টান্তসমূহকে বিসর্জন দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যত ছাত্র ও ছাত্রীবন্ধুদের জন্য এমন সমস্ত আদর্শ রেখে যান যাদের কেন্দ্র করে তারা এগিয়ে যেতে পারবে আরও সুন্দর, পবিত্র, নির্মল এবং বলিষ্ঠ এক ভবিষ্যতের দিকে।

ষ্টুডিবেকার নিউমডেল ?—

একদিন এক ভদ্রলোক তাঁর প্রাইভেট গাড়ী করে বেড়াতে বেড়িয়েছেন। এমন সময় বেশ কিছু দূরে ঠিক তাঁর গাড়ীর সামনাসামনি এক টাক মাথা ভদ্রলোককে দেখতে পান। তিনি সামনে যাচ্ছেন না পেছনে আসছেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর মাথার প্রায় চার দিকেই খুব সুন্দর চকচকে টাক। হর্ন দিলেও তিনি শুনতে পান না! যাই হোক ভদ্রলোক হর্ন বাজাতে বাজাতে সেই টাক মাথা ভদ্রলোকের কাছে গাড়ী থামিয়ে তাঁকে ডেকে বললেন 'ও মশাই শুনুন।'

ভদ্রলোক কাছে আসতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'দেখুন কিছু মনে করবেন না ; আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—আচ্ছা, আপনি কি ষ্টুডিবেকার নিউমডেল ?'

'কি যা তা বলছেন আপনি ?' দস্তুরমত রেগে যান টাকমাথা ভদ্রলোক।

'না এমনি বলছিলাম, কারণ আপনি আসেন না যান ঠিক বোঝা যায় না। আমার গাড়ী চালাতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল' বলে ভদ্রলোক রাগের সাথে গাড়ী চালিয়ে চলে গেলেন।

বর্ষা—

এবার বর্ষারাণী খুব সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে না আসলেও—একেবারে নিরাভরণ দেহে আসেন নি। বর্ষার আগমনে তথাকথিত বাবুদের হয়ত একটু অসুবিধে হতে পারে কিন্তু ভারতের বুকে এই বর্ষণধারা যে কি অমূল্য সম্পদ তা বলে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। বর্ষার বিদায় অভ্যর্থনার সাথে সাথে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি সুন্দর এবং নির্মল শরৎকে—যে বাস্তবকে করে তোলে এক কল্পনার রাজত্ব।

ধর্ম্মঘটের মরশুম—

চারিদিকেই কেবল ধর্ম্মঘট আর ধর্ম্মঘট। বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, রিক্সা, সাইকেল, গরুর গাড়ী, আফিস, দোকান, বাজার, রেষ্টুরেণ্ট, ডাইক্লিনিং, ধোপা, মুচি, মেথর, বন্ধু-বান্ধব, স্বামী-স্ত্রী, স্কুল, কলেজ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, রাস্তাঘাট যেখানেই যাই, সব জায়গাতেই ধর্ম্মঘট লেগে আছে। ভাবছি ধর্ম্মঘটের নামে এত অধর্ম্ম সইবে কি? আচ্ছা আমার মতে খাওয়ার ওপর ধর্ম্মঘট করলে কেমন হয়? তা হলেইত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তা না হলে আর কদিন পরে দেশলাইএর কাঠিরা হয়ত বলবে 'আমরা আর জ্বলব না।' ধানের বীজেরা বলবে 'আমরা আর শস্য ফলাব না।' আলো, বাতাস, জলেরা হয়ত বলবে 'আমরা আর কাজ করব না'। সর্ব্বনাশ—তখন উপায় ?

তারপর হয়ত শুনব গরুঘোড়ারাও ধর্ম্মঘট করে বসে আছে। কি? না তারা আর গাড়ী টানবে না। গাধারা আর কাপড় বইবে না। কেন গাধাদের মালিকরাও একটু বোঝা যারে নিক। কেবল গাধারাই মাল টেনে নিয়ে যাবে? এ হতেই পারে না—গাধারা কি আর মানুষ না?

প্লেগের হিড়িক—

কিছুদিন আগে প্লেগের নামে খুব একটা হিড়িক লেগেছিল। প্লেগ খুব সংক্রামক ব্যাধি সন্দেহ নেই—কিছু লোক মারাও গিয়েছিল। কিন্তু প্লেগের হিড়িকে অনেক সময় অনেক উপকারও হয়। শহর থেকে লোক কমে যায়, অনেক জিনিষ পত্তরের দাম কমে যায়, বাড়ীঘর খালি পাওয়া যায়, হাসপাতালে গিয়ে কিছুদিন আরামে থেকে আসা যায় ; কিন্তু ইদানিং একটা নতুন ব্যাপার দেখলাম যে প্লেগের হিড়িকে স্কুল-কলেজের পরীক্ষা বন্ধ করবার চেষ্টাও করা যায়।

ASUTOSH COLLEGE BASKETBALL TEAM

(INTER COLLEGIATE RUNNERS-UP 1948)

COMMERCE

Standing (from left)—Saroj Banerjee, Taposh Halder, Indrajit Mukherji, Manishi Mukherji, Prititosh Banerjee, Suvash Banerjee, Sunil Das Gupta, Pratul Bardhan Roy, Pranab Guha.

Sitting (from left)—Nanigopal Goswami (Games Secretary), Gopal Chatterji (Captain), Prof. Sisir Ranjan Chatterji (Prof.-in-Charge Games), Principal Khagendra Nath Sen, Prafulla Sarkar.

On Ground (from left)—Sachin Banerjee, Santosh Mukherji, Rathin Ray Chowdhury.

COUNCIL OF THE STUDENTS' UNION
(COMMERCE DEPARTMENT)
1947-48

Sitting (from left)—Biswaranjan Chatterji, Saroj Banerjee (Assistant General Secretary), Prof. Bibhuti Bhusan Ghosal (President), Principal Khagendra Nath Sen, Indrajit Mukherji, (General Secretary).

Standing : (from left)—Gobinda Mondal (Common Room Secretary), Paresh Sinharoy (Debating & Cultural Secretary), Pratul Bardhanray, Nanigopal Goswami (Games Secretary), Sunil Das Gupta (Magazine Secy.), Salil Bose, Amal Chatterji, Pranab Guha.

গরলামৃতম্

তাপস রঞ্জন হালদার—চতুর্থ বর্ষ, বাণিজ্য

পশ্চিমের জানালা দিয়া ভাসিয়া আসিল মৃদু গুঞ্জরণ। বিরক্ত হইয়া শেল্‌ফ্‌ হইতে জেন অষ্টেনের একখানা বই টানিয়া লইলাম, প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস। তাকাইয়া রহিলাম বইয়ের খোলা পাতার পানে। মুখের ভাষা বন্দী হইয়াছে মূক হরফের মাঝে। একটা আত্মপ্রসাদের আনন্দে হাসিয়া উঠিলাম। পুরাতনকে ঠেলিয়া আগাইয়া আসিতেছে নবীনের দল। পুরাণো পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। লক্ষ কোটী নর রক্তে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে নূতন ধরণীর। আমি কেবল অতীতের স্মৃতি বুকে জড়াইয়া বসিয়া আছি। নবীনের পূজারী। চলিয়াছে সেই চিরন্তন শাশ্বত পথ ধরিয়া। অতীত চলিয়া গিয়াছে ভাবীকালের জন্য পদে পদে চিহ্ন আঁকিয়া। আগামী দিনের মানুষ চলিয়াছে ভবিষ্যতের পানে বিগত দিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া। কিন্তু আমি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। নবীনতার নামে আগামী দিনের সহিত ব্যভিচার করি না। আত্ম-গৌরবের হাসি হাসিয়া কী ভুল করিয়াছি ?

"ভুল করেছি মিতা, এবারটি মাপ কর।"

ও রণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। পাশের বাড়ীর যুবকটি কথা, কহিতেছে তাহার নব পরিণীতার সহিত।

শুনিলাম, "ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু বিনাসর্ত্তে নয়।"

সহানুভূতির একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বেচারী বাঁধা পড়িয়াছে, ঠিক ঐ বইয়ের ভাষার মতো।

গৌতমের কণ্ঠ শুনিলাম, "বল কি তোমার সর্ত্ত ?"

মেয়েটি কহিল, "আর তুমি এ ভাবে টাকা খরচ করতে পারবে না।"

বিব্রত হইয়া উঠিল গৌতম। কহিল, "বারে, টাকা তো বাবা খরচ করার জন্যেই রেখে গেছেন। মদ খাই না, জুয়ো খেলি না, কোনো বদ খেয়াল নেই,—শুধু তোমার জন্যে একটা গাড়ী, তাও যদি না বল, তবে এত টাকা নিয়ে করব কি ?"

মেয়েটি হাসিয়া উঠিল। কহিল, "ওতে আমাকে ভোলাতে পারবে না। জান তো মা আমার নাম রেখেছিলেন অনমিতা।"

গৌতমের হাসিও শুনিলাম, "চমৎকার ভবিষ্যদৃষ্টি ছিল তাঁর।"

বিরক্ত হইয়া সরিয়া আসিলাম। সেই পুরাণো প্রেমের আবর কাটা। হাসি পাইল—ইহারাই তরুণ। আসিয়া দাঁড়াইলাম দক্ষিণের বারান্দায়।

সাম্‌নের ফুটপাতে কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে একটি ভিখারী পরিবার। সকাল হইতে ইহাদের কলরবে মুখরিত হইয়া ওঠে সমস্ত পাড়াটি। একটি আধাবয়সী রমণী প্রতিদিন চিৎকার করিয়া গালি দেয় একটি বছর দশেকের ছেলেকে। দম ফুরাইয়া গেলে কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনে নিজের কাছে। তাহার পর নৃশংসভাবে উলঙ্গ ছেলেটাকে ঠেঙ্গাইতে থাকে। খানিকক্ষণ নীরবে মার খাইয়া হঠাৎ আচমকা কান ছাড়াইয়া লয় ছেলেটা। তাহার পর কদর্য্য ভাষায় গালাগাল করে মায়ের উদ্দেশ্যে। তাড়া করিয়া যায় রমণীটি। অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়া পালায় ছেলেটা। কিছুক্ষণ রমণীটি নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের উদ্দেশ্যে অশ্রান্তভাবে কটূক্তি করিয়া চলে। তাহার পর নিশ্চিন্ত-ভাবে পা ছড়াইয়া খুঁটিতে বসে সর্ব্বাঙ্গে খাওলি। বছর ষোলো সতেরোর মেয়েটা শতছিন্ন মলিন বস্ত্রখানি দেহে জড়াইয়া লয়। তাহার পর ধীরে ধীরে মায়ের মাথাটি টানিয়া লইয়া উকুন বাছিতে বসে। আধ ঘণ্টা পরে দু'জনেই উঠিয়া দাঁড়ায়, দুই পথ ধরিয়া বাহির হয় ভিক্ষায়। ফিরে প্রায় সন্ধ্যায়। ইঁটের উনুন পাতিয়া মাটীর হাঁড়িতে

রাঁধিতে বসে। ছেলেটাও ফিরিয়া আসে সারাদিন পরে, আধোপোড়া বিড়ি টানিতে টানিতে।

ইহাই এই পরিবারের দৈনন্দিন বৈচিত্রহীন জীবন-যাত্রা প্রণালী। আজো ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মাতাপুত্রী রাঁধিতে বসিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহাদের আলাপের অমীল কথার টুকরা কানে আসিতেছে।

মাথা ধরিয়া উঠিল পাশের পুকুরের পচা পাঁকের গন্ধ। তাহার সহিত মিশিয়াছে পুকুর পাড়ের ঘেঁটু ফুলের তীব্র গন্ধ। অসহ্য গরম পড়িয়াছে। ঘরে আসিয়া পাখা খুলিয়া বসিলাম। ফ্লাওয়ার ভাস হইতে রজনীগন্ধার তোড়াটি মুখের 'পরে চাপিয়া ধরিলাম। পৃথিবীর রস বিন্দু বিন্দু আকর্ষণ করিয়া জন্মিয়াছে এই ফুল। ইহার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে আমার প্রতিটি শিরার প্রাণস্পন্দন।

কতক্ষণ এইভাবে বসিয়াছিলাম জানি না। সচকিত হইয়া উঠিলাম গৌতমের কণ্ঠস্বরে। কহিতেছে, "কি মানিয়েছে তোমায় মিতা, নূতন শাড়ীটায়। এতো সুন্দর তুমি!

অনমিতার মৃদু হাসি কানে আসিল। চাপা গলায় সে বলিল, "আর তুমি?"

পাশের ঘরের বাতি নিভিয়া গেল। পায়ের শব্দ শুনিলাম। বেড়াইতে গেল দু'জনে।

আবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথের ভিখারী পরিবারটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছেলেটা কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে একপাশে। অস্ফুট আলোকে রমণীটির পায়ের ঘাগুলি দপ্‌দপ্‌ করিতেছে। মেয়েটার ছিন্ন বসন ব্যবধান।

অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া ছিলাম সেইদিকে। অকস্মাৎ সুতীব্র হর্ণের শব্দে সচকিত হইয়া উঠিলাম। গৌতমের সযত্নক্রীত সানবিম ট্যালবটখানা ক্রুদ্ধ ভ্রমরের ন্যায় একবার গর্জ্জন করিয়া পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চিন্তার তন্ত্রীতে জট পড়িয়াছে—ছাড়াইতে পারিতেছি না। আঁধার মিশিয়াছে আলোকের সহিত আলোক। সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এই নিয়ম। কোনদিন ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই—ঘটিবে না। তারকার পাশে তারকা চিরকাল ঘুরিতেছে—ঘুরিবেও চিরকাল, কিন্তু তাহাদের ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য কোনোদিন ঘুচিবে না। এতক্ষণে এক ঝলক ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া ঢুকিল। থামের গায়ে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিলাম।

চোখ খুলিলাম খানিক পরে। ফুটপাথের পানে দৃষ্টি পড়িল। দেয়ালের ছায়ার সহিত মিশিয়া আর একটি ছায়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে ভিখারী মেয়েটার পানে। তাহার পর একটি ছায়া অপর একটি ছায়ায় লীন হইয়া গেল।

চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলাম এতক্ষণ। হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। ঘেঁটুফুলের তীব্র অসহ্য গন্ধের সহিত মিশিয়াছে রজনীগন্ধা। অনমিতার ইভ্‌নিং ইন প্যারিসের সহিত পুকুরের পচা পাঁক একাকার হইয়া গিয়াছে।

টলিতে টলিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘেঁটুফুলের জঙ্গলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম রজনীগন্ধার তোড়াটি।

ব্যবধান

ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—তৃতীয় বর্ষ, বাণিজ্য

তোমার আমার মাঝে
রচিলে কি ব্যবধান
ভুলিয়া যাবে কি তুমি
গেয়েছিলে যত গান।
আমার ভুবনখানি
তোমার হাসি ও বাণী
প্রভাতের ফুল সম
জানি গো বিলায় দান।

যে মালা দিয়েছ মোরে
ঝরেনি তো ফুলদল,
স্বপনে জড়ান তারি'
সুরভিত পরিমল।
যে মালা দিলে গো ভুলে
আপনি নিবে কি খুলে
ক্ষণিক আলোর মত—
হ'য়ে যাবে অবসান।

আমরা যারা চলে যাচ্ছি

(দ্বিতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীদের পক্ষ থেকে)

বিদায় কথাটা এমনই একটা কথা যা মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য অহেতুক বেদনায় বোবা করে রাখে। কেমন যেন একটা অদ্ভুত মন-খারাপী সুর এই বিদায় কথাটাতে। আজ সকলের কাছে এসে বুঝতে পারছি—মনের মধ্যের ছোট বেদনা টুকু পীড়ন করছে আমাদের। বিদায় নেওয়াই চিরকালের নিয়ম। এর মধ্যে নতুনত্ব নেই। কিন্তু আজ দেখছি, বিদায়ের মধ্যে প্রচুর ঐশ্বর্য লুকোনো। আমাদের নিয়ে যে এতো সমারোহ, এতো আয়োজন অপেক্ষা করছিলো—তা কি আমরা ভেবেছিলাম? আমাদের আকাশ অকস্মাৎ এতো সৌভাগ্যের ভারে অবনত হয়ে পড়বে তা কে জানতো। অভিভূত হয়ে গিয়েছি—বলবার ভাষা হারিয়ে গেছে।

তবু কিছু বলতে হবে। আমরা আজ বিদায়ী। কবিরা, দার্শনিকরা বলে থাকেন যে, জীবনটা একটা চলার পথ। আজ আমার মনে কথাটা সত্যি মনে হচ্ছে। পথ চলতে কতো পথিকের সঙ্গেই না ধাক্কাধাক্কি লাগে—কে কার কথা মনে রাখে? আমাদের জীবনের অগ্রগতির পথে একদিন আমাদের বন্ধুদের দেখা পেয়েছিলাম। কতদূর আমরা এক পথে চলবার। কতো হাসি আনন্দ স্নেহ-প্রীতির বিনিময় করেছি; আমাদের মধ্যে লেগেছে কতো ঘাত, প্রতিঘাত, কতো তিক্ত সংঘাত। আমাদের মধ্যে শত্রুতা ছিল, মিত্রতাও ছিল; একতা ছিল, ঈর্ষা, নিন্দা, দলাদলিও ছিলো। কিন্তু আজ বিদায় নেবার পরম মুহূর্তটীতে একটা উদাস ঔদার্যে মন ভরে উঠলো—তোমাদেরও-আমাদেরও। আজ ঈর্ষা নেই, নিন্দা নেই, দলাদলি নেই।

তোমাদের পথ থেকে আমাদের পথ বেঁকে গেলো। তোমাদের আমরা ভুলবো না। অনেকদিন পরে সকলের কথা মনে পড়বে—মন কেমন করবে—ইচ্ছে হবে ছুটো হাত বাড়িয়ে সকলকে জড়িয়ে ধরি। মনে পড়বে, ভোর বেলায় আধ-ঘুমন্ত আপ্‌সা চোখে রাস্তায় হোঁচট্ খেতে খেতে কলেজে এসেছি উর্দ্ধশ্বাসে—আর মনে মনে কলেজের মুণ্ডপাত করেছি। সুখস্বপ্নের মতো মনে পড়বে—হাজরা পার্কের কথা—খেলার মাঠের শিশির ভেজা ঘাস নতুন ওঠা রোদ্দুরে ঝিলমিল করছে; বইয়ের গন্ধে ভরা ঠাণ্ডা রহস্যময় লাইব্রেরী—বড়ো বড়ো ক্লাসরুমগুলো আমাদের অভাবে যেন খাঁ খাঁ করছে—যদিও খাঁ খাঁ করবে না—তবু মনে হবে; পিপো টেবিলটাকে আদর করতে ইচ্ছে করবে। মনে পড়বে তোমাদের সবার চেনা চেনা মুখগুলো আর অধ্যাপকদের গম্ভীর গম্ভীর চেহারা। সহস্র কর্মব্যস্ততার ফাঁকেও মন ঘুরে মরবে কলেজেরই আশে পাশে। সমস্ত ছবিগুলো জমা রইল আমাদের মনের সিন্দুকে—অনেক মণির মাঝখানে সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে উজ্জ্বল। তোমাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, স্নেহ, শুভেচ্ছা ভালোবাসা, তা অমূল্য, তাকে আমরা চিরকাল মর্য্যাদা দেবো।

আর, আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের কাছে বলছি যে আমাদের অগ্রগতির পথে তাঁরা যে শুভকামনা, যে আন্তরিক, ও অফুরন্ত উদ্যম দান করেছেন, তার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা হয়তো আমরা দিতে পারিনি—তার জন্য আমরা মার্জনা চাইছি। আমরাই তো ভবিষ্যতের মুক্তিদাতা। তোমাদের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ভবিষ্যত জাগবে—জাগবে নতুন আশা, নতুন ভাষা, নতুন চেতনা—আমরাই তো music makers. আমরাই তো dreamers of the dream—। আমাদের সেই সোনার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার আগে আমরা তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ দাবী করছি, আর রেখে যাচ্ছি সুগভীর কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও প্রণতি।

আর, বন্ধুরা—তোমাদের জন্য রইলো অজস্র শুভকামনা।

আমরা একদিন এই কলেজে এসেছিলাম—বড়ো হবার প্রচণ্ড আশা নিয়ে। আমরা বড়ো হবো—অনেক বড়ো—গান্ধীর চেয়েও বড়ো, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো—হিমালয়ের চেয়েও বড়ো—আকাশে ঠেকবে আমাদের মাথা। আমাদের চোখে ছিলো দিগন্ত প্রসারী স্বপ্ন। আমরা চলে যাচ্ছি কিন্তু এখানকার প্রতিটি আনাচে কানাচে ঘুরবে আমাদের নামের প্রতিধ্বনি-প্রত্যেকটি ধূলি কণায় ভাসবে আমাদেরই আকাশ ছোঁওয়া স্বপ্নের আভাস। বিশ্ব সংসারের পটভূমিকায় আমাদের একথা হয়তো তুচ্ছ। কিন্তু তবু আমি হতাশ হই না—তবুও বলি—আমরা চলে যাচ্ছি, একথাই বড়ো কথা নয়। আমরা এখানে একদিন এসেছিলাম—আমরা এখানে একদিন ছিলাম আমাদের বলিষ্ঠ অস্তিত্ব নিয়ে একথা চরম সত্য। জানি আশুতোষ কলেজের ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে মূল্যবান অধ্যায়টি আমাদেরই নিয়ে রচিত। জানি, এ আমার নিছক আত্মসান্ত্বনার কথা। কিন্তু এ মিথ্যা আত্মপ্রসাদেও আমি হতাশ হই না—জানি, এই ইতিহাসেরই পাতার মধ্যে আমাদের পশ্চাতের আমি অমর হয়ে আছে।

এই ইতিহাস—এই ইতিহাসের বাকী আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ছন্দে ছন্দে। পশ্চাতের এই ইতিহাস আমাদের সমুখের পথে দীপ জ্বালাচ্ছে। একে অস্বীকার করার শক্তি নেই। আমাদের চিন্তার কোণে এ বাসা বেঁধেছে—আমাদের হৃদয়ের সমুদ্রে, আমাদের অন্তরের পৃথিবীতে যে অবিনশ্বর ইতিহাস কথা কইছে—তাকে, ইতিহাসের সেই অবিচ্ছিন্ন ধারাকে অভিনন্দন। সেই অবিচ্ছেদ্য ইতিহাসকে প্রণাম।

বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি

বিবরণী ১৯৫৮ সাল।

বিগত ২২ই জানুয়ারী সোমবার আমাদের বর্তমান বৎসরের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। বর্তমান বছরের কার্যকরী সমিতিতে আছেন এঁরা: সভাবিনায়ক—শ্রীসোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি—শ্রীঅমিয় রতন মুখোপাধ্যায়; সহ-সভাপতি—শ্রীস্মৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদক—শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য; সহ-সম্পাদক—শ্রীবীরেন চৌধুরী। সদস্যবৃন্দ:—কালিসাধন মুখোপাধ্যায়, সরোজ গুপ্ত, অশোক ভট্টাচার্য, ভোলানাথ দত্ত, অরুণ বন্দোপাধ্যায়, শ্যাম সুন্দর বন্দোপাধ্যায়, সলিল ভট্টাচার্য, বীরেশ্বর হালদার। পরে এঁদেরও বাঙ্‌লা সাহিত্যসমিতির বিশেষ সদস্য রূপে গ্রহণ করা হয়। সুধীর মজুমদার, অমল কান্ত রায় চৌধুরী, শুভ্রদাস দত্ত, রবীন বন্দোপাধ্যায়, চির বন্ধু সেন, সুভাস চন্দ্র বসু, হর বল্লভ চৌধুরী, দীপ্তিময় ভট্টাচার্য, কমলেন্দু রায় সরকার, কেশব চৌধুরী, এবং জ্যোতেন গুহ রায়।

শরৎ স্মৃতি বার্ষিকী—

গত ৬ই মাঘ মঙ্গলবার বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে শরৎ স্মৃতি বার্ষিক উদযাপিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিল চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। শরৎ সাহিত্য বিষয়ে উপস্থিত অধ্যাপক-বৃন্দ ও ছাত্রদের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় শরৎ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের ভুলোর উল্লেখ করেন।

প্রাচীর পত্র—

গত ৬ই মাঘ আমাদের প্রাচীর পত্রের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিল চক্রবর্তী মহাশয়। বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতির ইতিহাসে প্রাচীর পত্রের প্রকাশ এই প্রথম। এ পর্যন্ত প্রাচীর পত্রের তেরটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

সারস্বত সম্মেলন—

প্রতি বছরের মত এবারও সরস্বতী পুজোর পরদিন সারস্বত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গান ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মধু কুমার ভট্টাচার্য হাস্যকৌতুকে অংশ গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতি মহাশয়গণ সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় অনেক অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন সদস্যদের সংগে মিলনী—

এবারও প্রতি বছরের মত বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি বর্তমান সভ্যরা প্রাক্তন সদস্যদের সংগে মিলিত হন। সভায় সমিতির বর্তমান বছরের সভাপতি অধ্যাপক অমিয় রতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সভায় গত বছরের ও এ বছরের প্রায় সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন সম্পাদক ও সহ-সভাপতি বর্তমান বছরের সমিতির উপর গভীর আস্থা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে তাঁরা যা করতে পারেননি তা বর্তমান সমিতি করতে পারবে। গত ও বর্তমান বছরের সকল সদস্যই বক্তৃতা করেন। বর্তমান বছরের সমিতির পক্ষ থেকে প্রাক্তন সদস্যদের একটি বিদায়-অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। সভাপতি মহাশয় বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতির কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলেন। সামান্য জল যোগের পর সভা ভংগ হয়।

গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা—

বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে এবছর একটি গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় কলেজের খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করেন এবং কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী ও সুলেখিকা শ্রীমতী বাণী রায় যথাক্রমে গল্প ও কবিতার বিচারক ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় গল্প অধিক সংখ্যক না আসার ফলে একটি মাত্র পুরস্কার দেওয়া হবে সমিতি স্থির করেছেন এবং তা পাবেন বুদ্ধদেব বসু (চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান)। কবিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে নীরদ বরণ চক্রবর্তী (৪র্থ বর্ষ, কলা) শ্যামা প্রসাদ দে (২য় বর্ষ, কলা); প্রসাদ দত্ত (৪র্থ বর্ষ, বিজ্ঞান)।

সাহিত্য অধিবেশন—

আমাদের প্রথম সাহিত্য অধিবেশন মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতির অন্যতম সদস্য অশোক ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প পাঠ করা হয়। সভায় অধিকাংশ ছাত্রই সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

সম্পাদক—গোপাল ভট্টাচার্য।

আমাদের ছাত্রাবাস

আগামী কালের বলিষ্ঠ মানুষ গড়ে তোলবার জন্যে আজকের দিনে কলেজের সঙ্গে সঙ্গে কলেজ ছাত্রাবাসের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। কলেজের ছাত্ররা আসে শিক্ষালাভের আশায়। তাদের লব্ধ পুথিগত শিক্ষা সত্যিকার বাস্তব জীবনে কতখানি কার্যকরী হলে তার খানিকটা আভাষ পাওয়া যায় কলেজ ছাত্রাবাসের ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে। তাই আন্তরিক কলেজ ছাত্রাবাসের একান্ত ঘরোয়া জীবনে মুহূর্তরূপের খানিকটা পরিচয় কলেজ পত্রিকার মারফতে আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

[বাহান্ন]

ছাত্রাবাস

শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে সমগ্র জাতির সুখদুঃখে আমরাও ছিলাম সচেতন। তাই আমাদের বিরাম চলিক মানবের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বোধহয় আমরা দলছাড়া হয়ে যাইনি। সমগ্র দেশ যখন ২৩শে ও ২৬শে জানুয়ারী অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল আমরাও তাতে অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করিনি।

তারপর এল ২২শে শ্রাবণ। সেই মহাকবির মৃত্যুদিবস আমরা পালন করেছিলাম অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেছিলেন আমাদের কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষাল।

৩০শে জানুয়ারী সমগ্র ভারতবর্ষে এক বিরাট বিপর্য্যয় ঘটে গেল আততায়ীর হাতে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যুতে যখন সমগ্র জগতে শোকে বেদনায় মুহ্যমান, তখন আমরাও ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ প্রিয় বাপুজীর অমর আত্মার প্রতি ভক্তি পূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছিলাম।

এবারও ছাত্রাবাসে বাণী-অর্চ্চনার আয়োজন করা হয়েছিল। তাকে সম্পূর্ণরূপে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে বাইরের বহু শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করবার জন্যে শ্রীঅরুণ কুমার সান্যাল (সংস্কৃত সম্পাদক) ও শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী (সহকারী সম্পাদক) আমার ধন্যবাদের পাত্র।

খেলাধূলাও আমাদের ছাত্রাবাসের আবাসিকদের পড়াশুনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। এ বছর খেলাধূলার পরিচালনার ভার ছিল শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের উপর। তিনি ছাত্রদের ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার সুযোগ দিয়ে ও বাইরের বহু দলের সহিত প্রতিযোগিতা করে তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ যোগ্য যে আমাদের ছাত্রাবাসের আবাসিক শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় "চ্যাম্পিয়ানসিপ" পেয়ে এবং শ্রীরথীন্দ্র পালিতও পুরস্কার পেয়ে ছাত্রাবাসের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছেন।

এ বৎসর ছাত্রাবাসে প্রিফেক্ট পদে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীঅমল কুমার চট্টোপাধ্যায়। ছাত্রাবাসের সুস্থ ও শান্ত আবহাওয়া রক্ষার জন্য তাহার আপ্রান চেষ্টা প্রসংশনীয়।

১৯৪৭-৪৮ সেশন শেষ হতে চললো। আমাদের পূর্ব্ববর্তি আবাসিকগণ ছাত্রাবাসের যে সংস্কৃতি রক্ষা করে এসেছেন আমরাও তাকে বজায় রাখবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, আগামী বছরের কর্ম্মপরিষদ তাহা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবে……এ আশা নিয়ে আমি আমার বিবরণ শেষ করছি।

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীনন্দলাল বণিক

১৬, বসন্ত বোস রোড।

আমাদের নূতন ছাত্রাবাস

আমাদের নূতন ছাত্রাবাসের বাৎসরিক কার্য্যতালিকা প্রকাশের পূর্ব্বে প্রথমেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই নূতন ও পুরাতন বন্ধুদের। নূতন ছাত্রাবাসের নামকরণের সার্থকতা এবার সত্যই সার্থক হয়েছে। এতদিন আমাদের ছাত্রাবাস ছিল নামে নূতন, এখন নামের সঙ্গে কার্য্যেও নূতন হয়েছে। কি বাইরে, কি ভিতরে সর্ব্বস্থানেই ছাত্রাবাসের জীর্ণতা দূর হয়ে ছাত্রাবাস অনেকখানি সুস্থ ও সবল হয়েছে। ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্ম্মতৎপরতা ভিন্ন এত শীঘ্র সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমাদের প্রধান অসুবিধা যে ছাত্রাবাসে কোন কমনরুমের ব্যবস্থা নেই। এবার সরস্বতী পূজা বেশ জাঁক জমকের সঙ্গে হয়েছে। এ পূজা সাফল্যের জন্য সরস্বতী পূজা সম্পাদক নিমাই চৌধুরীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পূজার পরদিন কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রাবাসের প্রাক্তন বন্ধুদের সঙ্গে আবার আমরা মিলিত হতে পেরেছিলাম।

সাধারণসম্পাদক—শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায়

আশুতোষ কলেজ নূতন ছাত্রাবাস।

সম্পাদকীয়

আমাদের শ্রদ্ধেয় বিদায়ী অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রতিঃ

আমাদের আশুতোষ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে লালন-পালন করিয়া যে মহাপ্রাণ ব্যক্তি কলেজকে অঙ্কুর হইতে বিরাট মহীরুহে পরিণত করিয়াছেন, তিনি এইবার অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ মহাশয়ের তপস্যা ও সাধনা কলিকাতার এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন-গঠন ব্যাপারে কি সুপরিমাণে দায়ী তাহা আজ পরিমাণ করা কঠিন। তাঁহার নাম আশুতোষ কলেজের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তাঁহাকে ছাড়া আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে ভাবিতে পারি না। বাংলাদেশ তথা ভারত হইতে অজ্ঞানের তমিস্রা দূর করিবার জন্য মহাপ্রাণ স্যার আশুতোষ যে ধ্যান করিয়াছিলেন, ঋষিকল্প-চরিত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ মহাশয় তাহা মূর্ত্ত করিয়াছেন আশুতোষ কলেজের ভিতর দিয়া। Plain living and high thinking is no more বলিয়া Wordsworth আক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যক্ষ সিংহ মহাশয়ের চরিত্র লক্ষ করিলে মনে হয় অন্ততঃ তাঁহার মধ্যে Wordsworth এর আদর্শ অন্তরে রূপায়িত হইয়াছে। ছাত্র-সমাজের পক্ষ হইতে আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে অধ্যক্ষ সিংহ মহাশয় যেন কলেজে নিয়মিত তাঁহার পুণ্য উপস্থিতির দ্বারা সকলকে তমঃ হইতে জ্যোতির দিকে পরিচালনা করেন।

দেশীয় ভাষায় টেলিগ্রাম ঃ

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপারে আজও আমরা ইংরেজের অধীন। বিদেশী ভাষার নাগ-পাশ হইতে মুক্ত না হইলে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার জাতীয় ভাষার সাহায্যে সমস্ত কাজ পরিচালনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা আংশিক ভাবেও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। সরকারী চিঠিপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের পড়াশুনা পর্য্যন্ত এখনও ইংরেজীর মারফতেই চলিতেছে। দেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করিতে হইলে ভাষার প্রকাশভঙ্গীকে বহুমুখী করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টার প্রয়োজন। এই বিষয়ে দেশের শিক্ষাব্রতীরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অগ্রসর না হইলে দেশীয় ভাষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। সম্প্রতি আশুতোষ কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেশীয় ভাষার সাহায্যে কিরূপে টেলিগ্রাম আদান-প্রদান করা যায় তাহার সঙ্কেত উদ্ভাবন করিয়াছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার গবেষণার ফল জনসভায় ব্যক্ত ও সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাফির প্রবর্তনের জন্য তিনি ভারত সরকারের নিকট একটি ব্যবহারিক পরিকল্পনা প্রেরণ করিয়াছেন। টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রযুগে বাংলা বা হিন্দী ভাষায় কিরূপে সংবাদ পাঠানো যাইতে পারে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলে টেলিগ্রাফির ব্যাপারে দেশীয় ভাষার দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে দূর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এই পত্রিকায় অধ্যাপক মহাশয় কিভাবে বাংলায় টেলিগ্রাম করিতে হয়, সেই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধটি উৎসাহী ছাত্র ও ছাত্রীদের বিশেষ উপকারে আসিবে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাঁহার সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শোকবার্তা ঃ

আমাদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় অমলকুমার রায় চৌধুরী, পদার্থবিদ্যার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদ্বয় মহাদেবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং

বাণিজ্য শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সিদ্ধনাথ সেন মহাশয়গণ তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের ও সহকর্মীদের মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। যে-আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্তটিকে পর্য্যন্ত নিঃশেষিত করিলেন, সেই আদর্শের ভিতর দিয়াই তাঁহারা আমাদের নিকট চিরঞ্জীবী হইয়া থাকিবেন। জ্ঞানের বিস্তার করিতে করিতেই এই অধ্যাপকগণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন—মৃত্যুর পরেও তাঁহারা জ্ঞানময় লোকে অবস্থিতি করিবেন। আমরা তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই।

আমাদের লাইব্রেরীয়ানের কৃতিত্ব ঃ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম আমাদের কলেজের লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া লাইব্রেরীয়ানশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের তরফ হইতে অনুষ্ঠিত লাইব্রেরীয়ানশিপ পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহার কৃতিত্বের জন্য গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

দর্শনের অধ্যাপকের সম্মাননা ঃ

আমাদের কলেজের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৪৭ সালে বারানসীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশনে নীতিবিজ্ঞান ও সমাজ দর্শন বিভাগের বিভাগীয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া 'সামাজিক জীবনে দর্শনের স্থান' এই বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তাহা বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠেয় অধিবেশনে তাঁহাকে আলোচনার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। তাঁহার আলোচনার বিষয়বস্তু হইবে—Can there be any Philosophy of History? অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান যে সম্মান প্রদর্শন করিল তার জন্য আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

—(তেজেন গুহ রায়)

আন্তঃ এশিয়া সম্মেলন—

"Science tells us how to deal and how to kill" বিগত মার্চমাসে দিল্লীতে যে যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাহাতে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। ভারত তীর্থ মানব মনের মিলন-প্রচেষ্টার ইঙ্গিত। ভারতবর্ষ চিরকালই মিলন, সাম্য এবং শান্তির বাণী বিশ্বকে শুনিয়েছে। অতীতে ভারতীয় সাধনার যে মহত্তর ধারাগুলি এশিয়ার সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তাদের মর্ম্ম বাণী ছিল "অহিংসা, মিলন ও সাম্য।" তাই ভারতের আহ্বানে সমগ্র এশিয়াবাসী সাড়া দিয়েছে। দুর্গম গিরিপথ, গুহা, জনহীন মরুভূমি অতিক্রম করে এশিয়া মহাদেশের সর্ব্বদিক থেকে প্রায় আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি—চীন, নেপাল, রাশিয়া, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশ থেকে মিলনের তীর্থে একত্রিত হয়েছিল। সুদূর অতীতে এশিয়ার মিলনের প্রতীক ছিলেন ভগবান বুদ্ধ; এই নবযুগের মিলনের উপরে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন তাঁদের উত্তর সাধক মহামানব মহাত্মা গান্ধী। এই প্রতিনিধি অতিথিবৃন্দকে এবং দশ সহস্রাধিক দর্শক মণ্ডলীকে আমাদের ভারতভূমি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আমাদের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করেন—"মহা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এশিয়াবাসী আমরা ভীতিহীন চিত্তে ও পূর্ণোদ্যমে আমাদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইব। ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছে যে সৎ অবিনশ্বর। পণ্ডিত নেহেরু আন্তঃ এশিয়া সম্মেলন উদ্বোধন করে তাঁহার ভাষণে বলেন—"পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে, যে প্রাচীর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ করিতে হইলে আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। এ সম্মেলনে কেউ নেতা নয় এবং কেউ শিষ্যও নয়।" এই আদর্শ বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে হইবে। এই আদর্শের ধারক বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘকে আমরা সমর্থন করি। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ আমরা চাহি না। জাতীয়তাবাদকে আমরা কখনও আন্তর্জাতিক উন্নতির পরিপন্থী হইতে দিতে পারি না।

আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের নিজস্বরূপ ছাড়াও যে একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে তাহা প্রতিনিধিদের কণ্ঠে সুন্দররূপে ধ্বনিত হয়েছে। ইহুদীদের প্রতিনিধি ডাঃ ইমানুয়েল ওলসভাঙ্গার বলেছেন—'ইউরোপীয় জাতিবৃন্দকে আমরাই মুক্তির কথা শুনিয়েছি, এশিয়ার অমর আত্মাকে ইউরোপীয় দেহে সঞ্চারিত করবার প্রয়াস আমরাই করেছি। হয়ত সেই কারণে কৃতঘ্ন ইউরোপ আজ আমাদের ঘৃণা করে। তাই বহু শতাব্দী পরে আবার আমরা যখন ভ্রাতৃবোধে মিলিত হয়েছি তখন আমাদের এই মিলন ভবিষ্যত মহামিলনের পথে

সম্পাদকীয়

আমাদিগকে চালিত করুক।' আরব লীগের সম্পাদক আজম পাশা আরবের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনকে অভিনন্দিত করেন। চীনের প্রতিনিধি মিঃ চেন ইন্ ষুন্ এই সম্মেলনকে বিশ্বের সাথে এশিয়ার মিলন সেতু হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন—"সমগ্র বিশ্ব আমাদের স্বদেশ, Within the four Seas all men are brothers. সম্মেলনের আদর্শকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য একটি Asian Relation Organisation বা "এশিয়ার সম্পর্ক সংস্থা" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অস্থায়ী কার্যনির্বাহক সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পণ্ডিত নেহেরু।

অন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের ভেতর দিয়ে মহাকবি রবীন্দ্রনাথও মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করুক এই আমাদের প্রার্থনা। এশিয়াবাসী চিরদিন মানুষকে ভগবানের সন্তান বলে শিক্ষা দিয়ে এসেছে। কিন্তু জড় সভ্যতার বিকাশের ফলে আধ্যাত্মবিদ্যা সর্বস্ব এশিয়ার সূর্য বহুদিন ধরে রাহুগ্রস্ত হয়ে আছে, কিন্তু এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে আবার কি করে এশিয়ার শান্তি ও প্রেমের মন্ত্র পুনর্জীবিত করা যায়। ভারতের মনীষীরা সে চেষ্টা করে এসেছেন। আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের ভেতর দিয়ে সে চেষ্টা সার্থক হবে এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

—সুনীল দাশগুপ্ত

তৃতীয় মহাযুদ্ধ—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নি-শিখা সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হইতে না হইতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া সুরু হইয়া গিয়াছে। মুসোলিনী, তোজো, হিটলার, প্রভৃতি যুদ্ধের উস্কানী দাতারা ধ্বংস হইলেও যুদ্ধ দেবতা প্রসন্ন হন নাই! আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে যুদ্ধের সময় আমরা মিত্রপক্ষকে যতটা সাত্ত্বিক প্রকৃতির মনে করিয়াছিলাম, বস্তুতঃ তাহারা ততটা নহে। আসলে তাহারা বক ধার্মিক মাত্র, বিপাকে পড়িয়া হরিনাম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজ সুযোগ বুঝিয়া আসল রূপ বাহির করিয়াছেন। সেই পুরাতন শাসন এবং শোষণের অধিকার লইয়াই তাহারা যুদ্ধাঙ্গনে নামিয়াছেন এবং সমগ্র বিশ্বকে মাতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, দুরাত্মার যেমন ছলের অভাব হয়না, তেমন রাষ্ট্রধুরন্ধরদের কদাপি বুলির অভাব হয় না, পুরাতন লোভ দম্ভ সাম্রাজ্য লিপ্সাকে তাহারা নূতন, নূতন বুলির সাহায্যে জনসাধারণকে ভুলাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাহারা কি ভুলিবে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তস্নান করিয়া যাহারা উঠিয়াছে, ক্ষতচিহ্ন সারিতে না সারিতেই তাহারা কি আরো ভয়ানক, আরো সর্বনাশক মহা আহবের মধ্যে অনলের উত্তাপে ঝাপাইয়া পড়িবে। আস্ফালন দেখিয়া আমরা ভীত চকিত, সঙ্কটের সময় সমাধানের জন্য যাহার মুখের দিকে তাকাইতাম সেই 'বুড়া' মহাত্মাজীকে মারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। "কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান" বলিয়া হাঁক ডাক মারিলেও কোন জোয়ানেরও টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না

আমাদের কলেজ—

আমাদের কলেজ কলিকাতার একটি বিশিষ্ট কলেজ, এতাবৎকাল যাবৎ একজন মাত্র অধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীনে কলেজের কার্যাদি নির্বাহ হইত। কলেজের গঠনতন্ত্রে এক বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ মহাশয়ের অবসর গ্রহণের পর কার্যকরী সমিতির এক বৈঠকে স্থির হয় যে এখন হইতে তিন বিভাগের তিনজন অধ্যক্ষ থাকিবেন, এবং তাহারাই স্ব স্ব বিভাগের কার্যাদি পরিচালনা করিবেন। আমাদের কলেজের ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্র সংখ্যার জন্য এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। কারণ একজন অধ্যক্ষের পক্ষে এতবড় একটি শিক্ষায়তনের দায়িত্বভার চালান কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল এখন হইতে প্রতি বিভাগের অধ্যক্ষের উপরই নিজ নিজ বিভাগের কার্যভার ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইল, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রীযুক্ত কালিদাস সেন মহাশয় প্রাতবিভাগের, শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিবা বিভাগের এবং শ্রীযুক্ত অমলেন্দু নাথ সেন মহাশয় সান্ধ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। কলেজের ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আমরা অধ্যক্ষত্রয়কে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

—পৃথ্বীশ রায় চৌধুরী

गंगा की रवानी

राधाकृष्ण राय—तृतीय वर्ष वाणिज्य

हर रोज नये दिन हैं हर रोज नई रातें।
हर रोज सुबह होती हर रोज नई बातें॥
मिलते हैं, बिछुड़ते हैं आते भि हैं जाते।
रोती हैं रुलाते हैं, हंसते हैं भि गाते॥
यह रोज का है किस्सा है नित्य की कहानी।
रुकती न कभी पल भर गंगा की यह रवानी।
है शान्त कभी चंचल मस्ती से कभी गाती।
बेताब कभी बनकर प्रवाह लिये जाती।
है साफ कभी गंदली नित रंग बदलती है॥
मौजों से उछलती है आगे बढ़ी चलती है॥
इसकी जो कहानी है, जीवन की कहानी है।
रुकती न कभी पलभर गंगा की रवानी है।

[ছাপায়]

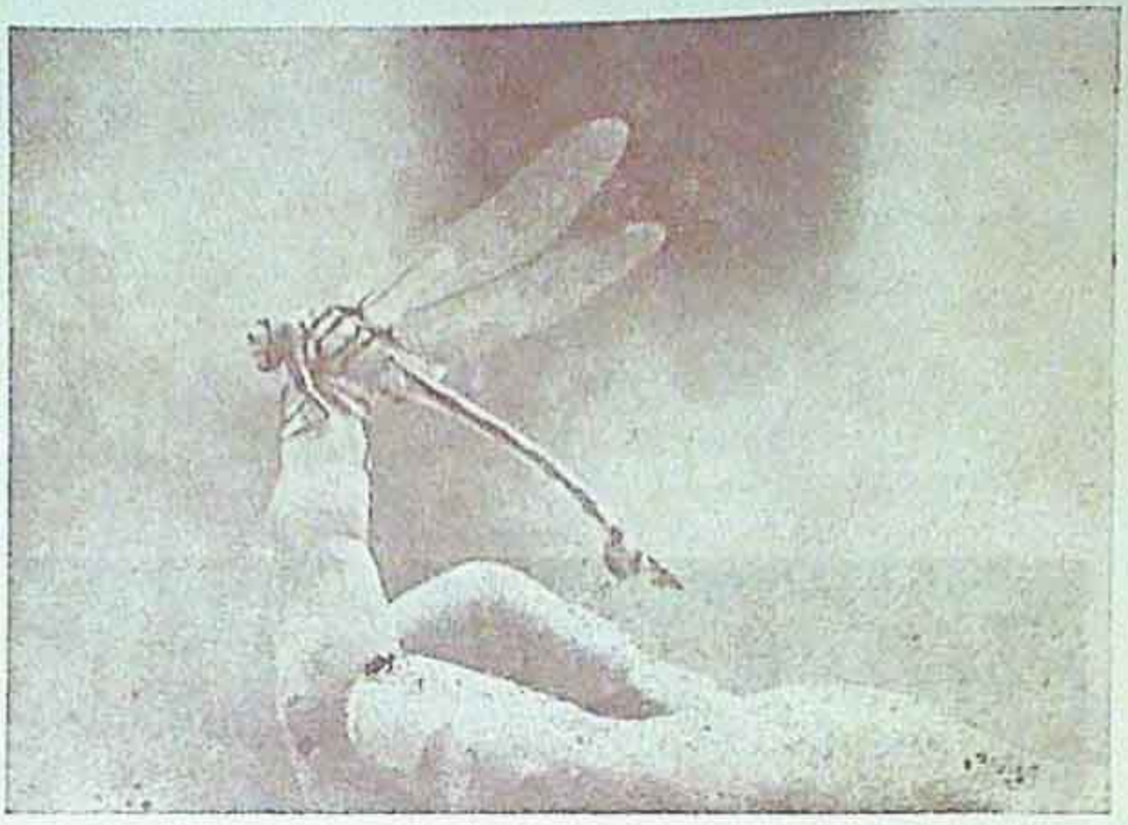

"বন্ধুত্ব"
আলোকচিত্রশিল্পী—অজিত মুখোপাধ্যায়—২য় বর্ষ (সাহিত্য)

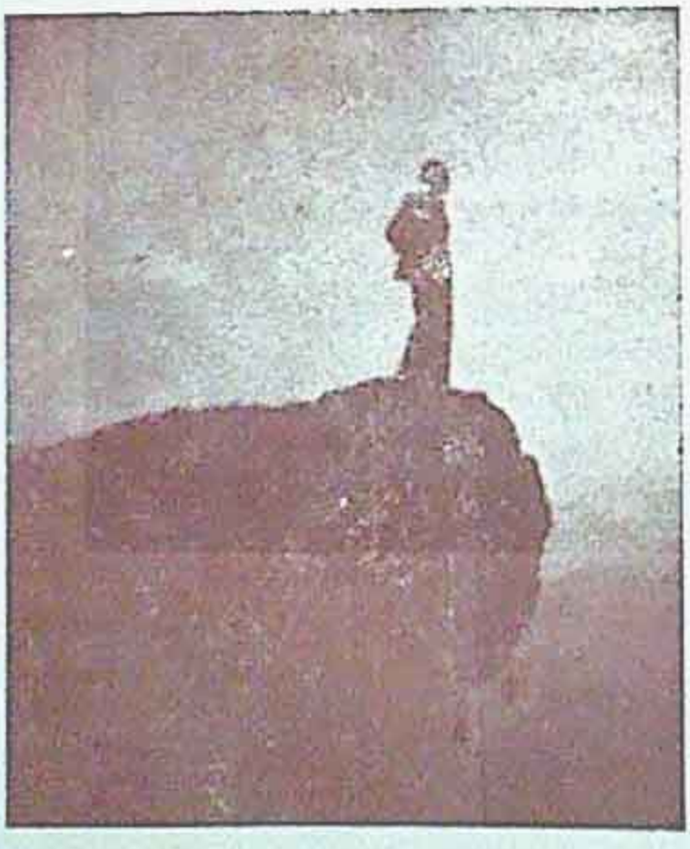

"অসীম নীরদ নয়, ওই গিরি হিমালয়।"
আলোকচিত্রশিল্পী—স্বপন ঘোষ—২য় বর্ষ (বিজ্ঞান)

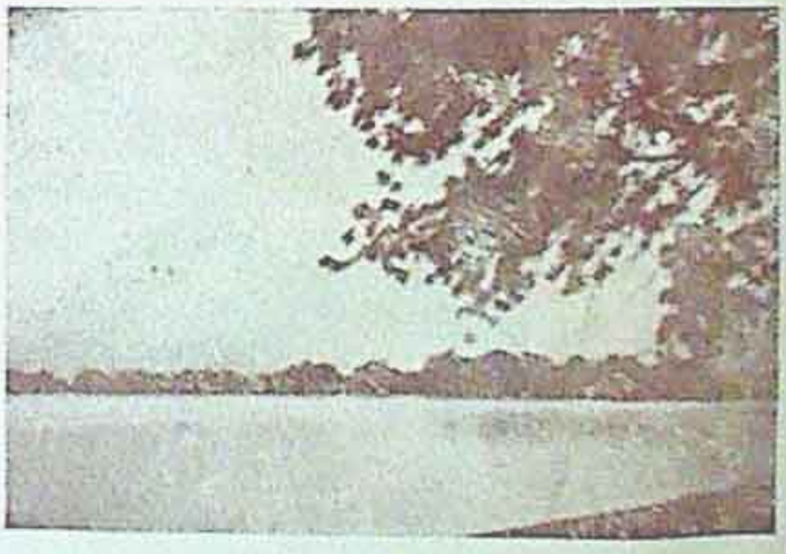

"দিনের শেষে"
আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীজ্যোতি—১ম বর্ষ (বাণিজ্য)

আশুতোষ কলেজ

সরস্বতী প্রতিমা
(১৯৪৮)

[আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীদুলাল গুঁই]

ECONOMIC INDIA—PRESENT AND FUTURE

GOUR MOHAN SEN (Third Year B. Com.)

The picture we see to-day of India apart from her political and communal conflicts is that she has no food and clothing, no health, no life. These are her actual wants and bare necessities—not comforts, nor luxuries. People have lost self-confidence and sunk into the depths of despair and inaction. They have become fatalists, because they have no power to rise above the conditions of life in which they find themselves. Their fate is predestined by the historical socio-economic order that somehow or other has always moved against them. Here people work but do not get enough and often they do not find work for mere subsistence. It indicates a great wastage of energy, for, the same human materials produce much better things or conditions of life in other countries. People have heard many a time of what a balanced diet is, but no systematic enquiry has been made as to how the common people of this country will procure this nutritive, balanced diet. It is for the Scientist, Technologist and Economist to devise some means for the economic progress in the fields of agriculture, industry and commerce.

Lack of new avenues of employment induced the people of India to fall back upon land as the source of living, resulting in subinfeudation in land, uneconomic cultivation, and low standard of living. No less than 70% of her total population is directly or indirectly dependent on it. Much of the land at present uncultivated can, however, be brought under the plough with the extension of irrigation. Though a prosperous agricultural system is a vital necessity for the economic well-being of her teeming millions, agriculture in India is carried on under highly unscientific and primitive conditions and as a matter of fact the agricultural output per acre of land here is one of the lowest in the world. These sorts of things cannot be allowed to go on any longer. The solution lies in the removal of the defects which have retarded the agricultural development of the country. Better supply of seeds (vernalisation of seeds where necessary), better manuring and good irrigation, co-operative farming on modern lines, movement of crops from the place of plenty to the place of scarcity, easy and cheap transportation facilities, better marketing facilities etc. can assure the cultivators of a better return from their labour and can make their land yield more. So there is no reason why India cannot be made self-sufficient as regards her foodstuffs. Above all, there must be wide diffusion of education in the country without which it is futile to expect a lasting improvement of the agricultural and consequently social conditions of the land.

The future of India, however, lies not only in further intensification of agriculture but also in gradual industrialisation of the

country. The eradication of zamindary system which is of great significance for the welfare of her human beings, will help the capital, so long dispersed over agriculture, to find suitable channels for investments, and thus assist the growth of trade and industries in the country. So long as there is no equilibrium maintained between agriculture and manufacturing industry, the mass must remain sunk in poverty. In spite of the bountiful gifts of nature, the people of India have not yet been able to exploit and fully utilise its abundant mineral and forest resources on modern scientific lines. The exploitation of forest trees especially the minor products and medecinal herbs, as an organized industry, is still in an undeveloped state. In the past, the Govt. of India merely looked on and did nothing substantial to secure industrialization of the country and due to this wicked policy India was so long the exporter of her important minerals which could have been utilized for developing her own industries had there been well-equipped social planning and state initiative. The World War II has caused India to develop some of her industries to a certain extent; but at present she is not getting enough machineries even for replacement of her depreciated plants, not to speak of augmenting the system. The hopes of increased production are therefore dashed to the ground. The country is now facing the evil consequences of inflation resulting in serious labour disputes; and there is the prime need of co-operation between Capital and Labour in order to harness all the resources available. Although big industries are essential for large scale production, at this stage of Indian economy an improvement of the existing cottage industries and their expansion should have a place in any scheme of social planning. That can ensure a better standard of living by making the best use of woman labour or other classes of the unemployed. From these points of view, revival of cottage industry is essential for wiping out or at least the minimising the effects of starvation, unemployment and devitalisation. The cottage industries must be guided along scientific lines and the problems of capital, raw material, marketing etc. should be solved by co-operative system..

India has neither a sufficient reserve of coal nor oil for her industrial progress; but the compensating feature is the enormity of her vast potential hydroelectric powers which are in the process of being harnessed by large schemes like Damodar Valley, Mahanadi, Kosi, Rihand and Tungavadra projects. These projects when compieted will irrigate about 6½ million acres of land and will produce about ten million k. w. of electricity. They will help in the fulfilment of great industrial possibilities and are designed for flood control, irrigation, navigations, checking of soil erosion, and sending cheap power even to the rural homes.

It is admitted from all quarters that economic progress depends on systematic researches. Every advanced country in the world has to bear the brunt of carrying on scientific researches in various spheres, the economic progress has to be commensurate with the successful results obtained from such researches and experiments. India should not only encourage but

render all the facilities for industrial and agricultural researches if she is to march with other advanced countries of the world. Of course it does not necessarily mean that she will imitate the method of other countries. She may face new problems peculiar to her own conditions and environments and therefore she must evolve a system of her own which fits in with the economic structure of the country.

The present roads and railways are not sufficient for inland communication and movement of goods. So they must be extended according to the needs of the country. Inspite of a long coastline and the benefits of sea, India is not a maritime country. Practically the whole of the seaborne trade had been arrogated by other nations of the world. India is, however, not lacking in materials needed for the development of her shipbuilding industry which opens up fresh avenues of employment. In these days of largescale production when all the commercial centres of the world are to be closely connected, aviation will also serve the useful purpose of helping the trade and accelerating communal intercourse and there is a vast possibility of the development of civil aviation. In the creation of national wealth aviation will play a very important role.

The main difficulties which stood in the way of India's economic progress were her political conditions. So long she had to consort with the British vested interest. Although she is now free from political bondage the economic nexus has not loosened her stranglehold. To overcome this critical stage is indeed a very difficult task and it requires good state planning both short and long term. The profit-making spirit of the individual enterprises and Joint Stock Companies should be controlled and regulated by the State so far as it goes against the interest of society. Production must be increased at any cost eliminating strikes to cope with the present inflation ; and to this end pleasant atmosphre should be created between Capital and Labour by setting a ratio of the profits to be split up between the parties. For periods long India was sound in her export drive and had a favourable balance of trade : but the last war has made the pendulum swing the other way. The statistics show a progressive deterioration in the output of industrial and agricultural product, resulting in a contraction of her export and an adverse balance of trade, while the import of foodstuff and other important and unimportant commodities from foreign countries shows a marked rise. The foreign countries which have some exportable surplus of foodstuff are taking undue advantage of India's food crisis by charging exhorbitant prices and thus compelling India to incur heavy expenditure for purchase of her important and essential commodities. At this juncture of Indian economy it has become essential for the State to nationlise the basic and key industries along with the major public utilities and should regulate and control and if necessary, finance private enterprises with proper safeguards. The sterling balance so far released is inadequate for the present need and loans must come from other foreign sources.

India is not in a position to bring about a rapid industrial development without the co-operation of the industrially advanced countries, and must look forward to them for important machineries and expert opinion. Although it is neither desirable nor wise to depend upon other countries for all time to come, incentive must be given to make India produce necessary experts in different branches. The present system of education is defective for it produces mainly clerks. She requires at the present stage more artisans, engineers, techicians etc. and to these ends engineering and technical schools should be widely established, for without technical and vocational education the economic life of an average Indian cannot be improved. State must also come forward to make primary education free and compulsory which will open the eyes of the millions of India, make them conscious of their responsibilities and make them frugal in their habits. Inspite of all these efforts in different fields of agriculture, industry and commerce, the country as a whole will not be prosperous so long her wealth is not equidistributed amongst her people. It is the state policy of India alone which will indicate her future economic prosperity.

IS THIS HUMANITY?

SOBHANLAL MOOKERJEA (Fourth Year Arts)

When the twilight hides itself in heron's wings,
When the fire-fly dances after the retreating moths,
When the cricket in mournful tune sings
Beside the bush of forget-me-nots,
My heart I lose in lots of pang and pain—
Humanity that suffers in protesting disdsin !

When before me is skilfully played
The manoevouring of hypocrites sly,
And a thousand entreaties said
Behind the back of lie,
My soul though a polluted air has breathed,
Remains a flaming sword, for ever unsheathed.

When humanity reaches the lowest level below—
A river sunk deep in thickest mud at summer,
When the primitive stages again appear to grow
And people do nothing but abject surrender
I feel the thrill of a wave of emotions
A light-house, facing the oceanic commotions.

When the innocent suffer for no fault of theirs,
Exposing their emaciated and exploited vitality,
Their skeletons I see waiting to taste the airs
Of salvation from a case of inhumanity.
My mind melts at their heart-rending sorrow,
Their load of pathos I want to share or borrow.

When someone comes, wrapped in various masks
Feigning to be a merely harmless dove,
I cannot but pity him who thus basks
In the sunshine of blandishments of love!
In him I find the remnant of humanity,
A garden, beggard and outraged by the loss of a tree.

When I see the people engaged
Somehow to drag the drudgery of life,
Yet occasionally becoming enraged
At others' prosperity in earthly strife,
I cannot well appreciate the race that is run
Of humanity blurred by the cobweb of tradition.

AVIATION IN INDIA

SUBRATA MUKHOPADYAY (First Year Science)

We Indians like any people in the World have from time immemorial longed to travel through air. Our epics and literature are replete with descriptions of air travel. In the Ramayana, we find Meghanada, the son of Ravana fighting from air and showering missiles on enemy beneath just as the modern airborne fighters drop down bombs and bullets on men below. In the Mahabharata, we see Arjuna gliding through air in the Puspaka chariot of Indra, the chief of the gods. Kalidas the great Indian poet, describes the flight of Ravana and Sita through air. Even the fairy tales told by our Indian grannies to their young listeners have for their heroes, princes who ride on winged horses through air at a tremendous speed and traverse vast tracts of land in the twinkling of an eye. We do not know whether all these

stories of air travel are mere figments of fancy or have any basis on reality. Let the historians and research workers theorise on it, but these references to air travel which exist in plenty in Indian life and literature prove beyond doubt that India had been sufficiently air-minded from the very dawn of civilisation.

Whatever may have been the fact in the remote past, it is now a grim reality that air travel which was sometime back in the region of fancy and imagination, is an accomplished fact. The regions so long monopolised by birds have been conquered by man by means of a machine which has brought about revolution in the system of transport. These machines first invented by the Wright Brothers of America and later perfected by other scientists of the World are today engaged in carrying mails, passenger and cargo in India. India has got them alright and without much headache from the westerners, and painful though it is, we have to say India's contribution to the development of aviation is nil. Still flying as a means of transport and as a higher form of sports has definitely come to stay in India. The first stage in the history of civil aviation in India was marked in 1929 with the inaugeration of the England-Karachi Mail Service—which was extended to Delhi next year and to Calcutta in 1933. At the beginning of the World War II India had only 158 civilian aircrafts 65 of which were used for private flying, 43 for training by clubs, 34 for regular air-service and the rest for commercial aviation. The Great War II had given a great stimulus to aviation in all countries and India has not been an exception to it. Though India had the bitter experience of aerial bombing on her territories, it must be the noted here that due to that war our country has now more well-trained pilots and aircraft engineers than before. But even this increased number of Indian technicians does not suffice to supply the minimum demand of our own airways. With the end of the war, the old airways companies that came into operation before 1939 and several new others have come into the picture once again and some more are in contemplation. The post-war plan envisages a network of air routes covering a total of 11220 miles. Many well-equipped aerodromes and landing grounds are to be constructed and some of these, if not all, should have night-flying facilities. There will be eleven ports which will regulate interval air services. India has at present only seven flying clubs and some more are expected to be opened. All these plans are rapidly taking shape but much more remains to be done. Compared with other foreign countries, aviation in India is in its infancy so to say. We have at present only seven airways owned by the Indian capitalists (I.N.A., A.I.L.P. Bharat Airways, Orient Airways, Mistry Airways, Air India Deccan Airways) and some foreign airways companies operating in our country. They connect the principal towns of India and link them up with the world abroad.

With an area of 17600000 sq. miles and a population of nearly 400 millions, India certainly lags far behind other countries of the world in respect of mileage of air routes. The National Government of our country, our Universities, and the Industrialists should wake up and develop the

airways in India. Private Flying should be encouraged and the Government should grant liberal subsidies to the instructional clubs to stimulate private enterprises. Gliding which is flying birdlike in the air with outstreched wings without a motor offers tremendous possibilities for India's progress in aviation, but it is regrettable that gliding clubs are practically non-existent in India. Gliding strengthens the nerves and stimulates the spirit of adventure—which are the only qualities to make a successful pilot. The establishment of gliding clubs should engage the serious attention of the Government Aeronautical Research laboratories for finding out ways and means to develop airways and aircraft industries in India should be established. Young air enthusiasts should be sent abroad in larger number for proper training in aeronautics. Indian youths as has been proved times without number make efficient airmen and they can take their share not only in the development of civil and commercial aviation but also in the aerial defence of their motherland. Given suitable opportunity they can make their country self-sufficient as regards her need of technical experts and pilots. India is not poor in respect of raw materials for the manufacture of aircrafts and her resources being harnessed, she can profitably manufacture her own aeroplanes. India is also an ideal country for air travel. Her sky for the most part of the year is clear blue and her non-foggy weather does not bewilder a pilot during flight. This extensive country of ours admits of further expansion of air routes which will go into the interiors where there is dearth of rail, road and river communications. If by means of air routes the interiors of India are connected with the outside world, her trade and commerce can be assured of a rapid development. In consideration of the appalling poverty of the Indian masses, some may think that India can ill afford the luxury of being air-minded. But how can India hope to recover from her present position unless her trade and commerce are developed.

Now it is for the National Government of India to decide whether India should march in step with the progressive nations of the world, which today practically live in an air-age, or should revert to the dark days of palanquins and bullock carts as the only means of transport. Certainly India will not prefer the latter. But if India is to be made airminded, a well-planned constructive programme should be taken in hand and translated into practice within a prescribed period. Then and then only we can hope to see India occupy a pride of place in the comity of nations of the world. Aviation will obliterate the barriers of distance and accelerate industrial development of the country. It will help her trade and commerce and connect her with the commercial centres of the world. In the near future, flying as a regular means of quick and easy transport will establish an international relationship and the winged riders of India will carry abroad their message of peace prosperity and progress.

ICE-SKATING AT SIMLA

MIRA ARORA, (Third Year B.A.)

One of the unique attractions of Simla is known as the Simla Ice-Skating Club. There is a beautiful stretch of level land which in summer provides four Tennis Courts and in Winter the Ice-Skating rink. In plain language, the rink is a big flat block of ice, one foot in height, with a very smooth surface. The Skaters have to wear boots with steel skates fitted underneath the soles. The skates are a double knife edge bent upwards in front where they have a serrated edge.

We were very much excited when Daddy told us that he had applied to the Club for enrolling us as Members.

Few days after he had broken the delightful tidings, we did get enrolled and receive our badges. We had red badges as all junior Members had; the seniors had yellow badges. We were now waiting anxiously for the day when we would really venture forth on the ice. Our counting of the days had not been in vain, the long expected day did arrive on the 10th of May. After all, skating could be possible only in a climate cold enough to prevent the ice from melting.

All this time I was thinking with some apprehension how I would fair on the rink. My brothers were at home in roller skating and they were confident of themselves. I was not familiar with roller skates; so I thought of getting better acquainted with it at home in order to make my travail and ordeal on the ice not a heart-breaking, soul-searing and uphill task. The idea, however, did not meet with the success it deserved and my youthful enthusiasm was badly shaken as I found my feet after some tough scrambles.

Soon the fateful day loomed forth in the horizon. As I broke the first ice I found out to my immense satisfaction that this was numberless times easier than roller skating.

The first day I was skating with the help of a chair which had long skates. The second day I was much better off and in a few days time I was quite adept at it. I had learnt a few tricks and some dancing steps on the rink.

We did not have skating every day as it depended on the weather. If it was even slightly cludy, there would be no skating that day. This apparently runs counter to to the belief shared by many that clouds make the atmosphere cooler. But contrary to this belief, we found that a clouded sky had an adverse effect on the hardness of ice which was indispensible for skating. It was explained by saying that clouds prevent radiation from the earth and thus cause this trouble.

In the morning, the skating took four hours to complete and in the evening three hours. A flying ballon attached to the Municipal Library used to be our sight as the skating was on. Any one who knows the hills would realises what fun and puzzlement it can sometimes cause to look out at the vast panorama that unfolds itself before our vision and try to visualise whether the ballon is visible or not. Skating is confined to the coldest months of December, January and February.

That year we had also the most interesting X'mas as a Fancy Dress Carnival had been arranged and in that icy atmosphere we really gave ourselves up in enjoyment.

OUR NEGLECTED RESOURCES

DIPANKAR BHATTACHARYA—Third Year, Science

During the last Science Congress Session held at Patna, Col. R. N. Chopra, in his presidential address has unfolded a chapter of Indian Science which was kept in the dark for ages. It was the science of Indian medicine. His address depicted a picture of the future Indian Pharmacopea and pointed out a clear path as to how to reconstruct it thoroughly. Truely speaking, the present system of medicine requires a complete change in our country. The problems and solutions, as discussed in the address, have caused a good deal of sensation among the modern pharma-specialists and discussions are now going on as to how to find out a suitable method which will be fit for our health and economic standard.

During the earliest period of Vedic age, when the Indians were proud of their position in all branches of Science, Indian medicine was a bit wonder to the rest of the world. The far-renowned *Ayurveda* of that time reached so much excellence that its several medicines were a puzzle to the West for centuries together. It was from the time of the *Moghala* that India lost her originality in medicine and uptil now India has to depend upon foreign pharmaceuticals to a considerable extent. The ancient *ayurveda* system, which still exists in our country and is studied by a particular group is a degenarated one and in comparison with its past, it has lost its excellence.

Now, the system of medicine which independent India will adopt, has become a great problem in our country. Indeed, it is a hard puzzle but it must have to be solved.

Drugs are generally of two kinds—one synthetic and the other natural. India is well acquainted with the system of natural drugs, as it exists in our land for a long time, probably from prehistoric period. Synthetic system is an imported item from the West. Due to advancement of chemistry in Western countries and also due to lack of natural resources, the westerners had to depend chiefly upon synthetic system of drugs. With the extension of western civilisation, it had not only influenced the social and economic life of our country, but also knocked down our own system. The influence was naturally poisoning and when we Indians realised it, it was too late.

Acharya P. C. Ray expressed deep sorrow at the evil effect which the foreign trade have caused in own country. He perceived that the western trade policy has driven out our own trade, and has broken down the back-bone of our country. Now we depend entirely upon foreign medicines and as a result of that we have our span of life much shortened. In an article, published in the Modern Review, Acharya Ray observed : Unless we drive out the giant western industries like Imperial Chemical Industries, from our country by some means, we will entirely fail to attain progress in chemical industry. Probably with that object in view he started the Chemical and Pharmaceutical concern

known as the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, for the production of Chemicals and Pharmaceuticals for the poor Indian masses. He thereby threw out a challenge to the Western industries. He struggled and his progress his sphere was but a few foot prints on the desert of ignorance and illiteracy of our land. Now, at this critical moment, these foot-prints are to guide us and we must follow them.

Acharya P. C. Ray devoted his life entirely in studying the herbs and plants and finally he was successful in his mission. He managed to find out drugs of high curative value. He was rather pained to find these herbs and plants of high potency lying in negligence for centuries. The Western countries availed themselves of this opportunity and managed to manufacture finished drugs in India out of our own natural resources, but sold them at a very high cost. This sad plight is still in our country, and if we do not get prepared in time, it will be a vital loss on our part.

A few herbs which are found in abundance in our land but which have got much importance in British Pharmacopea are discussed here. Their names will give an idea as to how blindly we are draining off our own wealth to the West. They are as follows: (1) Kurchi (Hoearrhena Antidysentrica) (2) Belladona leaves (Atropa balladona) (3) Neem bark (Melia azadiracta) (4) Cinchona bark (5) Asoka bark (Saraca Indica) (6) Kantikari (Solanum Xanthocarpum) (7) Gokhura (Tribulus terristin) (8) Brahmi Sak (Herpestis Mounera) (9) Senna pods (Cassia angustifolia) (10) Chirata (Swestia chirata) (11) Catechere (catechue migrum) (12) Gulandra (Triospora cordi folia), (13) Kuth (Sanssrea lappa) (14) Tea Waste (Camellia thirfera).

These herbs and their function on our daily life were found out by accidental searches. A strange story, regarding the discovery of Cinchona in Assam hillregion is told in our country. One day, in the hilly region of Assam, a man was lying unconcious with high fever by the side of a pool, partly filled up with fowl water, due to the heavy deposit of decomposed leaves and barks of the neighbouring plants. The man, returning to his senses, discovered himself into the pool but noticed that his fever was gone. With some thinking he came to the conclusion that this fowl water might have played the vital part in the recovery. Subsequent study of the barks and leaves of the neighbouring plants ascertained the presence of a natural resource which is of so much importence now-a-days.

Similar types of events are associated with the discovery of many natural drugs and probably as much as 76 of them have got so much importance that they are now adopted by the Western chemists in their own pharmacopea. Innumerable natural drug-containing herbs were studied by the Indians and the Ayurvedic system of medicine entirely depended upon these herbs and hence it reached so much excellence in the past. But since these herbs are now not utilised in proper fashion, they have lost their reputation.

The main cause for which we neglected our own treasure deserves careful study. From time immemorial the Ayurvedic

system was confined to a particular group of people. They have a handled it as their inherited business and utilised it to their own interests. No new researches were carried on. This sort of negligence in such a vital subject produced such a dangerous result that within a few centuries the fair face of our system was entirely changed and totally darkened. Now it has lost all popularity.

Not only, the Aurvedic system was destroyed in this manner, the other individual discoveries in natural drug system lead the discoveries to similar business loving attitude and as a result of it they are also in the way of destruction. There is a villege, Chadshi, in E. Bengal, where an excellent type of drug was developed. It was so powerful that it openly challenged the foreign surgery. Now, as the time went on, the sphere of study of this drug became so much reduced that no person other than a member of a partlcular community and a keen believer in the goddess Manasha was allowed to learn the secrets of the medicine.. These sorts of mean attitude naturally bring downfall in the sphere of scieutific activities.

Now, to solve the medicinal problem of to-day India should depend upon her own resources. Nature has blessed India with a vast quantity of natural drugs. Why do not the Indians utilise them for their own cause? In the presidential address Col. Chopra also gave such a hint. But one point here should be noted that whichever medicine India adops—the synthetic or the natural—it should be rebuilt thoroughly on the basis of modern science in order to compete with foreign drugs in efficiency. There are many problems which the natural drug manufacturing concerns will have to face and these must be overcome by scientific plans and suggestions. Here a big problem arises. Although there are many possibilities for the development of Indian medicine, India is poorly developed in this respect. Indeed, India posseses several drug research laboratories, such as School of Tropical Medicine in Calcutta, Hoffkins Research Institute in Bombay and some other institutions in other places. They have discovered a few vital drugs by dint of their research works but sadly enough, these are still confined in their test-tubes and research diaries. It is ture some pharmaceutical works in Calcutta have managed to manufacture them to some extent but still they are not sufficient. What the present India requires is a systemetic way by which medicines of high curative value can be made available to the masses.

The actual difficulty in the process of large scale production is due to the lack of adequete technical knowledge in Pharmaceutical manufacturing process. In order to satisfy the present requirements, it is suggested that Indian students should be send abroad, specially to America, Switzerland or England so that a well-trained group with sufficient knowledge in scientific manufacturing process can be built up.

Now, if India decides to depend upon her own natural drugs, their a particular group of scientists will be required to assist the pharmaceutical chemists. They are the Botanists. The plants used now-a-days for medical purpose are generally

used in a raw state, i.e. in the state in which they are found in nature. These plants not only reduce the efficacy of the drugs but also cause a retarding effect in the curative potency of the other species in production. It is indeed a heavy loss and so botanists are invited in the field. They are to be employed in developing the drug-bearing plants to the highest potentialities on the basis of modern science. They must work to see that not a bit of their utility contents is wasted due to negligence. Then only natural resourses in India will be utilised in a proper way.

As India posseses vast resources in herbs of rich drug contents and as according to the Bhore Committee Report India requires 5000 more pharma-specialists within ten years in order to utilise them, it is expected that our neglected resources will be utilised for the benefit of the poor masses.

THE DARKEST EVENING

NIRMALENDU DUTTA ROY—Third Year, Science

The evening was normal and usual. The city was crowded and full of activities. Trams and Buses were loaded upto the maximum capacity, with the passengers returning home after the days work. Everybody was busy with his respective works. Some were enjoying the city life, some were engaged in marketing. So it was an evening full of activities. The sky was clear and the appearance of the city was gay. Inspite of the pomp and grandeur, that was the darkest evening which India has ever met.

As the evening lights were switched on the city was flooded with light. Suddenly "the bolt came from the blue." A whisper "Mahatmaji is shot dead !" was heard. Within a moment the whole atmosphere was changed. Calcutta was stunned. Many began weeping. The news sprerd like wild fire throughout the length and breadth of the city. Everybody had to repeat the news three or four times before others could understand.

"What ? Mahatmaji dead ?" The sentence came out from everybody's lips before hearing the whole report of the calamity. When convinced to some extent of the accuracy of the news everybody became pale and stood on the spot like a statue. The various recent works of Mahatmaji in Beliaghata and parts of Calcutta for the communal amity were still fresh in memory. Though the news was confirmed and announced by A.I.R. at short intervals in different languages still nobody could believe. Grief striken groups thronged round houses and shops possessing radio sets to listen to the elaboration of the earlier news. All the activities of the city were cancelled and the atmosphere was calm.

There was nobody to preach anything, nobody to declare what to do at that moment, and people could find no way to

express their grief. But everything was spontaneous. The beggar of the street stopped begging, the hawker stopped hawking, the shop-keeper stopped selling. All the activities including the enjoyments of the city were cancelled. The sweet tune of the bag-pipes of the marriage ceremony was stopped with a jerk. The festival procession dispersed from the midway. The jolly atmosphere of the city became gloomy within an hour. Everybody, from the beggar of the street to the millionaireof the palace felt that the Nation was orphaned. They have lost their dearest ones. As the hours were passing, the intensity of the sorrow grew deeper and deeper. The moment soon came when all the sorrow of the Indian nation expressed itself through a single, lonely voice broadcasting from New Delhi. The voice was of our great leader and Prime Minister. He began with a quivering voice, full of emotion with the words, "Friends and Comrades! The light has gone out of our lives and there is darkness every where." The true feelings of the dumb millions of India! He began with a tone of despair, but finished with a hopeful and determined one. As the people became anxious to hear something more from the leaders, a voice chocked with grief but firm came out. It was of our Deputy Prime Minister. He also finished with the same tone. Both of them advised the people not to do anything which could hamper the ideals of Mahatmaji.

Being sure of the calamity everybody returned home broken hearted. The common question of the day was, who is now to guide India? Who is there to hear the words of sorrow and need of the dumb millions irrespective of caste, creed and religion? Who would be the judge of our daily quarrels? Who would save the world from the atomic war and lead the world towards wisdom and peace

India has achieved something through Gandhiji which she could do through no king, no saint, no man of any kind. In a country, geographically, politically and religiously so diverse, he created a unity of ideals. So India without Mahatma Gandhi is scarcely imaginable for us.

Still let us depend upon Sri Aurovindo's words, "... The light which led us to freedom, though not yet to unity, still burns and will burn on till it conquers. I believe firmly that a great and united future is the destiny of this nation and its peoples. The power that brought us through so much struggle and suffering to freedom, will achieve also, through whatever strife or trouble, the aim which so poignantly occupied the thoughts of the fallen leader at the time of his tragic ending; as it brought us to freedom, it will bring us unity."

Though we have lost the greatest man of the world—the father of the Indian nation—still we have his message amongst us, for which the Indian nation can boast to the world. It will guide India towards prosperity and peace. So long Gandhiji's spirit and ideals exist, India also will exist. And there are so many Jawharlals to fullfil the dream of our great departed leader.

May Gandhiji's ideals live long.

BOOK REVIEW

HAND BOOK OF ECONOMIC GEOGRAPHY, 2 Vols.
By Professor Sivaprasad Mukherjee, M.A. (Com.), M.A. (Econ.). (H. Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta. Vol. I, Rs. 6-8, Vol. II, Rs. 3-12)

The study of Economic Geography is gradually gaining in importance and popularity. Intrinsically difficult as the subject is, an intelligent appreciation of it presupposes the reader's acquaintance with sciences like Geology, Meteorology, Physiography, Economics etc. But a perusal of Prof. Mukherjee's book on Economic Geography will convince any body that the complexity of the subject is only apparent and that the topics if presented in a lucid and systematic manner can be made easily intelligible even to the uninitiated. The first volume describes and explains the differences in production in the various parts of the globe, enquires into the determining causes of such differences, and suggests possibilities for further economic development. The second volume is intended to show the position of India in relation to other parts of the world and against the back-ground of its division into two independent dominions. Both the volumes embody a good deal of authentic statistical data. No less than one hundred maps have been incorporated into the book to facilitate easy assimilation of the subject. Clarity of presentation, comprehensiveness of discussions, and authenticity of the data are the distinguishing features of the book. We are sure that not only the I.A. and B. Com students for whom the book has been specially meant, but the general reader also will find it immensely valuable. Prof. Mukherjee's book removes a long felt need of the students of Economic Geography and the author is to be congratulated on the valuable price of work.

K. B.

OUR UNION

Morning Department

The present Students' Union of the Girls was formed just about the end of February, 1948, a little later than the usual time. We are thankful to Prof. Arundhati Sen to agree to be the President of the Union.

Amidst the joys of the newly won freedom we started our work. It was a time of general unrest. The restlessness of the country was hightened by partition. The miseries of the public led us to undertake certain political and social activities. We sympathised with the strikers, with the refugees and contributed certain amount of mony towards their relief.

With regard to our social activities the fare-well party and the excursion stand out prominent. We have greeted the outgoing students of the fourth and the second year classes, with hearty congratulation. Principal K. D. Sen presided over the function. We also have enjoyed the excursion heartily. We extend our cordial thanks to the college authority for the troubles they have taken to make it successful.

The annual college sport was timely performed and the result was very satisfactory. Above all Miss Nilima Ganguly made a striking achievement in the Inter College Girls Sport by winning the Individual championship.

We celebrated the Saraswati Puja in co-operation with the Boys' Union amidst great festivity and success. I thank those who volunteered their services on the occassion. We also celebrated the Independence Day on the 15th August in co-operation with the Boys' Union.

We prayed for the daparted soul of the two of our Professors—Prof. Amal Kumar Roy Chowdhury and Prof. Mahadeb Chakraborty.

Just before departing I express my sincere thanks to Prof. Arundhati Sen and to all the workers of the Union and friends who have helped us to achieve our purpose.

BELA GANGULY
General Secretery

OUR UNION

Day Department

We took over charge from our predecessors rather late, towards the middle of January 1948. The task which confronted us immediately on our assumption of office was the celebration of the Netaji Day. We observed the day with due dignity and solemnity. In the evening of the Netaji Day a procession was taken out from our college ; it merged with a bigger torchbearer procession before the Netaji Bhawan.

But only a few days after the occassion the whole of India was stunned by the news of Gandhiji's death. The great national calamity plunged the whole of the Country in mourning. It is a great tragedy that Gandhiji—the father of our nation—who out of dust had created us man, is no more. His death has left a void in our national life, which can never be filled. All the students and professors assembled to condole over the demise of the Great Departed.

The three departments of our college combined to perform the Saraswati Puja, which was celebrated with great pomp and eclat. Thanks are due to the unremitting efforts of the organizers and the unstinted co-operation of all the departments concerned.

During the year under review the college suffered an irreparable loss by the death of Professors Amal Roy Chowdhury, Mahadeb Chakraborty and Siddhanath Sen who had dedicated thier lives to the cause of education and upliftment of this college. Our heart-felt sympathies go to the respective bereaved families. May their souls rest in peace.

After having served the college for thirty two glorious years our revered Principal Panchanan Sinha retired in 1947. It is difficult to think of our college without him. He was so much a part of this great institution. We wish him a happy retirement.

With the expiry of our term, it is with a heart weighed down with grief and remembrance of our long association with the college that we hand over to our successors in office. We hope that they will keep up the tradition of the college and be true to our glorious heritage and carry on undaunted against all heavy odds.

SECRETARY, STUDENTS' UNION

OUR UNION

Commerce Department

The Students' Union of the Commerce Department was a baby union when we received it in trust from the outgoing Secretary, Sri Santosh Mukherjee. Though all credit is due to Sri S. Mukherjee for nursing it for one-year and leaving it to us as a union healthy and full of promise, we had yet to make supreme effort to keep it in health and activity. We had to see that it did not lapse into moribund inactivity and die out.

Almost immediately after we took over, we had a happy occasion to celebrate. It was the birthday of Netaji.

The Saraswati Puja came off in February. The Puja was a joint ceremony of the three departments.

The anniversary of the death of Poet Rabindra nath was observed in the Memorial Hall which was fully decorated. Sri Pramathanath Bisi was the chief guest at the function which was presided over by our Principal.

GAMES—Inter-section Table Tennis and Carrom Competitions were held in the Common Room of our College. Many students participated and the final in Table Tennis was played between Sri Suhas Dutt of 4th Year B. Com. Class Section B and Tapas Halder of 4th Year B. Com. Class Section A. Some exhibition matches were arranged on the day of the final and players of repute were invited and took part. Principal K. N. Sen (the then Vice-Principal) presided and gave away the prizes. Honourable mention must be made of Sri Kali Singh, Games and Sports Secretary, Sri Suresh Nandy, Assistant Games Secretary and Sri Ajoy Kumar Mozumder, who made the tournaments successful by their efforts.

The Annual Sports meeting was held on the 26th December, 1947 on the University Athletic Grounds. Principal P. Sinha encouraged the students with his presence. Mr. S. N. Modak, I.C.S. (Retd), presided and gave away the prizes. The Tug-of-War, Go-as-You-like, Professors' Race and the Bearers Race were interesting features in the sports programme. Sri Prafulla Guha of 3rd Year won the Individual championship.

DEBATE—A few debating competition were also held. At the annual debating competition, the

first three positions were captured by Sri Mrinal Nandy (2nd Year) Sri R Ghosh (4th Year) and Sri N. Kabra (4th Year) respectively, I take this opportunity to thank Sri Mrinal Nandy, Cultural and Debating Secretary for his activities in this section of the Union.

INAUGURATION OF COMMERCE DEPARTMENT—Commerce Department inauguration day was observed on the 17th December, 1947 in a befitting manner. The function was held in the Memorial Hall, Principal P. Sinha opened the function and Sri Pramatha Nath Banerjee, Vice-Chancellor Calcutta University, honoured the occasion with his presence as the Chief Guest, Sri Khagendra N. Sen (the Vice-principal) then was the president for the occasion.

Before concluding we place before the general Secretary of the Union and the College authorities, some problems of our department that urgently require solution. In our time we have no doubt, purchased many books for the Common Room but the number of Books is still insufficient and inadequent for this growing department. Further additions are necessary.

We would specially urge on the authorities for the solution of the housing problem of Commerce Students. Commerce Students are greatly suffering for want of a Hostel. Its want is being the more felt due to the acute housing shortage in Calcutta. The problem of honing the students has, in fact assumed serious proportions and demands immediate attention for its solution.

SANAT KUMAR BASU
General Secretary

ANNUAL SOCIAL GATHERING

Day Department

When every pleasant thing seems to be in short supply and festive occasion is to us doubly welcome, the necessity relieving us of the monotony of existence was long felt, but unforeseen circumstances stood in the way of an early achievement of our aim.

It was with the purpose of bringing novelty in our routine existence that an Annual Social Gathering was held in the Asutosh Memorial Hall under the auspices of the Students' Union, Day Department. Principal Someswar Prasad Mukherji, Professor Sibnath Chakravorty, President of the Students' Union and several other professors graced the function by their presence. Our revered Principal was in the chair whose presence and unremitting help encourged and inspired us to greater activity.

A Committee which was formed with the purpose of organising the function, did its work well, for which thanks must be given to all the members of the Committee, whose unflagging enthusiasm and zeal made our function smooth and easy.

Several artists of repute viz. Messrs Hemanta Mukherji, Sachin Gupta, Prodyot Narayan, Samaresh Roy, Amulya Sanyal, Ajit Chatterji, Prof. Dutta and several others held us enthralled by their performances. I must thank those artists who contributed so much to the success of the function.

Our thanks are also due to Sri Soroshi Ganguly of our gymnasium and his party whose feats were highly appreciated by the gathering.

AJIT PRASANNA SEN
Vice-President, Students' Union

COLLEGE ATHLETICS

Day Department

The record of our sporting activities this year is one about which we can legitimately feel proud. The college football team should be congratulated for its glorious performance. They have won the inter-collegiate league championship by defeating all the Colleges of Calcutta. It was indeed a happy occasion when the shield was exhibited before the students. The College Team also won this year the Elliot Shield which is regarded as the most coretable trophy among the colleges of Bengal.

The achievements of the college in the field of athletics and sports last year were equally bright. The College Team reached the final in the league championship which was unfortunately not played due to want of time. In cricket we had played the final and were defeated by a narrow margin. In hockey the college team come out victorious and won the Asutost Choudhury Cup by defeating other colleges. In basket ball we reached the final. In the inter-varsity sports some of our students achieved good success. In the inter-collegiate sports our college acquired a large position. Last but not the least the college crew had won the inter-collegiate regatta. we offer our congratulations to the winners who brought honour to their college. We hope the new entrants in the college will feel inspired joy the achievements of their predecessors and will try to retain to the great name of the college not merely in scholarship and academic sphere but in sports as well.

LIBRARY